লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ৮ম সংখ্যা

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ১০ সফর, ১৪৩৯ হিজরি | ৩১ ইখা, ১৩৯৬ হি. শা. | ৩১ অক্টোবর, ২০১৭ ঈসাব্দ

Baitus Salaam, Saint Prix, FRANCE

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত

‘শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া’

পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

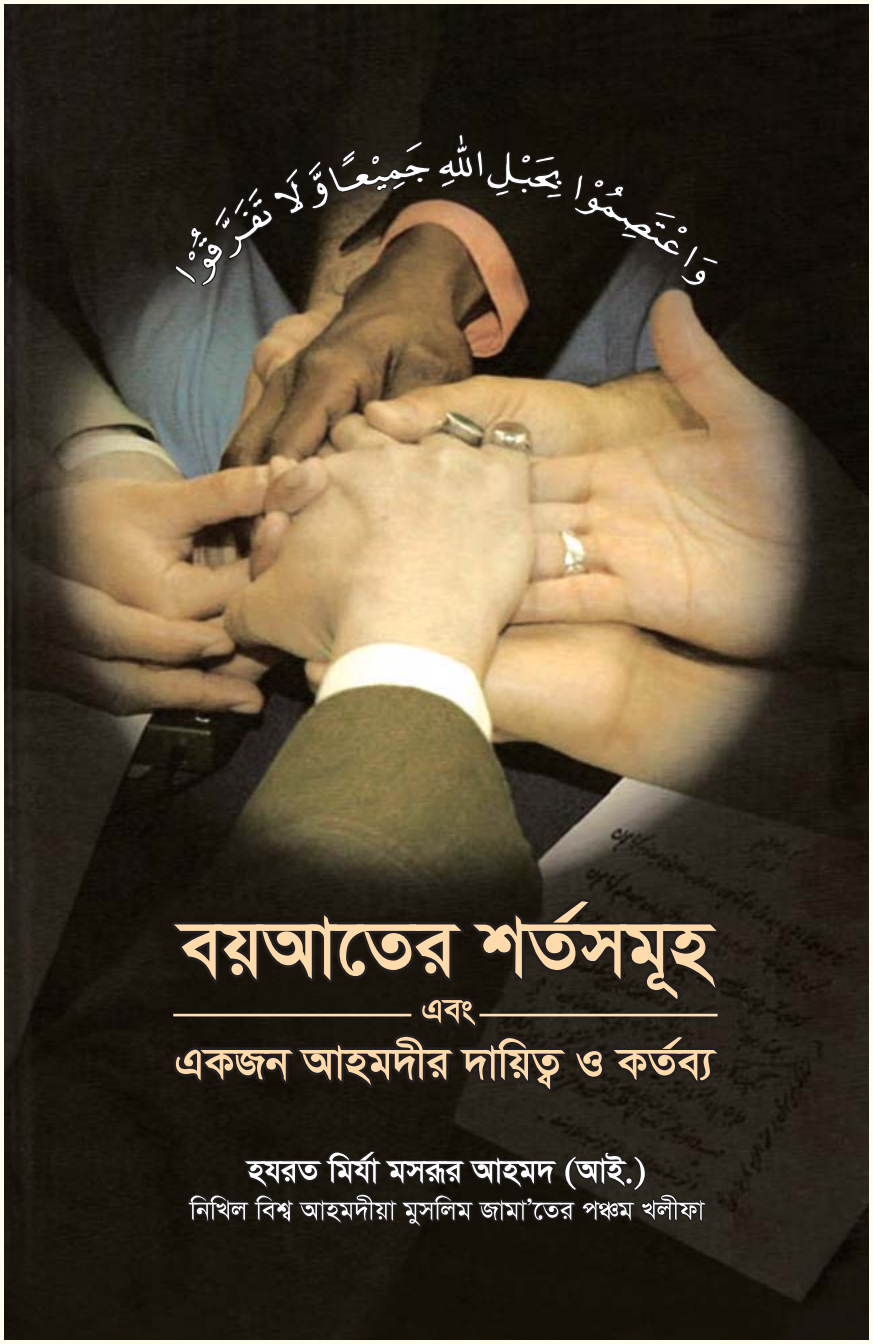

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি ‘গাইড বুক’ বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত,
বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি?
প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

ইসলাম আহমদীয়াত: রহমান খোদার করুণার বিরামহীন বর্ষণ

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত মহান আল্লাহ্‌র মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে প্রধানতম একটি গুণ হচ্ছে **আর্-রাহমান** (পরম দয়াময়)। এটি এমন একটি সত্য-বৈশিষ্ট্য যার উল্লেখ উদ্দেশ্যহীনভাবে বা অকারণে করা হয় নাই বরং এর মাঝে রয়েছে এক সুগভীর প্রজ্ঞা। অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে এই একক বৈশিষ্ট্যটির তাৎপর্য উপলব্ধিতে যখন কেউ অগ্রসর হয় আর এতে সক্ষমতা লাভ করে , তার বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। জগতের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে আল্লাহর **রহমানিয়্যত** (পরম দয়া)-এর ছায়া কি চমৎকারভাবে করুণা বিস্তার করে চলছে, যুগে যুগে পবিত্র কুরআনের তফসীরকারকেরা তা তুলে ধরেছেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের সূক্ষাতিসূক্ষ নিখুঁত নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ আর সার্বিক ত্রুটিমুক্ত পরিকল্পনাধীনে এ বিশ্ব-চরাচরের সুশৃংখল ফলপ্রসূ সক্রিয় অবস্থান, এ অনন্য বৈশিষ্টের সুস্পষ্ট জানান দিচ্ছে।

মানব-সৃষ্টি রহস্যের মূলে যেমন রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্মপূর্ণ এ গুণের বিকাশ, তেমনই তার বেড়ে ওঠা আর ধাপে ধাপে ক্রমোন্নতির সচল ধারায় সযত্নে আগলিয়ে রাখা এসবই এ গুণের আশিসময় প্রতিফলন। যাকিছু আমাদের চারপাশটা ঘিরে রয়েছে, প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের সবটা অবিরত যোগান দিয়ে চলছে তা আমাদের। মানবের এই অগ্রযাত্রা সত্যিকারে কতটা মূল্যবান, এর উন্নতি পরিমাপ করতে চাইলে পরিবর্তনের চূঁড়ার অবস্থানটি কোথায়, তা জানা আবশ্যক। নৈতিক মূল্যবোধ আর সামাজিক মঙ্গল-চেতনা অনুধাবনের সংবেদী সক্ষমতা হলো এর মানদণ্ড। ক্রমোন্নত সভ্যতার প্রতিটি স্তরে সংঘটিত পরিবর্তণ লক্ষ্যনীয়। প্রস্তর-যুগ থেকে লৌহ-যুগ, শিল্প-বিপ্লব থেকে তৎ-পরবর্তী আবিষ্কারাদি ও এর প্রায়োগিকতায় সামাজিক সুফল লাভের ক্ষেত্রে সভ্যতার কেন্দ্রীয় আদলে অসাধারণ বৈশিষ্টগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। তবে বিশ্ব-সভ্যতার সামগ্রিক এই উন্নয়নধারা বিকশিত হওয়ার মূল পরিকল্পনাকারী স্বয়ং আর্-রহমান আল্লাহ্ -ই।

একইভাবে, আধ্যাত্মিক বিবর্তন-ধারার প্রতিটি পর্যায়ে মানবের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর মনোনীত নবী এবং খলিফাগণের হাতে। তাঁর সর্বাত্মক আশিসপ্রাপ্ত এই মনোনীত জনেরা আধ্যাত্মিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার আলো বিতরণের মাধ্যমে, মানুষকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে টেনেছেন আর তাদেরকেও পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে সহমর্মী হয়ে আত্মনিবেদনে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন, আর তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ এক মানবজাতিতে পরিণত করে শান্তিময় এক পৃথিবী গড়ার পথ দেখিয়েছেন মহানবী (সা.)।

আজকের যুগে, ইসলাম আহমদীয়াতের খিলাফত সেই মহান কাজটিকে পুণরায় পূর্ণতা দিতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই এক বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে ২৩ নভেম্বর ১৯৩৪ জারীকৃত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ২য় খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর 'তাহরীকে জাদীদ' নামক ঐশী পরিকল্পনায়। এর আওতায় বিশ্বব্যাপী মহা কর্মযজ্ঞ সাধিত হচ্ছে। অসাধারণ বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে ধর্মজগতে আর মানবসেবামুলক কাজেও।

তাহরীকে জাদীদ নব বিশ্বব্যবস্থার অগ্রদূত স্বরূপ

কুরবাণীর মানদণ্ডে 'তাহরীকে জাদীদ'এর অসাধারণ এক মর্যাদা রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি, তাহরীকে জাদীদের কর্মসূচীতে যারা অংশ গ্রহণ করে তারা নব-বিশ্ব নির্মাণে সবিশেষ অবদান রাখে।

'তাহরীকে জাদীদ' নমুনারূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় নির্দেশাবলীর সংক্ষিপ্ত ধারক। কোন কোন ব্যক্তি ভুলক্রমে মনে করে আর্থিক কুরবাণীর আহরিত অর্থ সম্পদ শুধুমাত্র প্রচার কার্যক্রমকে তুলে ধরতে ব্যয়ীত হবে। এটা যথাসিদ্ধ নয়। কুরবাণীতে আরো অগ্রসর হয়ে তাহরীকে জাদীদ যখন পূর্ণাঙ্গীনভাবে ওসীয়্যত-ব্যবস্থার আওতাধীন হবে, তখন আহরিত সে অর্থ ব্যয় হবে বাহ্যিকভাবে প্রচার এবং সেই প্রচারের কার্যকর রূপদান উভয়েরই জন্য। প্রচার কার্যক্রম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি নব ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নও এতে নিহিত, যার আওতায় সম্মানজনকভাবে প্রত্যেকের জীবনোপরকরণ যোগানো হবে। ওসীয়্যতের ব্যবস্থা যখন পূর্ণাঙ্গীন রূপ পাবে তখন তদ্বারা কেবল প্রচারই হবে না বরং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের চাহিদাকে এ দ্বারা মিটিয়ে দেয়া হবে আর সমগ্র বিশ্ব থেকে দুঃখ-দুর্দশা বিদূরীত করে দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ্। পিতৃ-মাতৃহীন (এতীম)-রা ভিক্ষা চাইবে না, বিধবারা মানুষের কাছে হাত পাতবে না, অসহায়েরা কাতর চিত্তে ছুটা-ছুটি করবে না, কারণ ওসীয়্যত হবে এতীমের মা, যুবদের পিতা আর নারীর ভালোবাসা। বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে, পারস্পরিক প্রেম, প্রীতিডোরের বাঁধন, ভালবাসা আর মমতাপূর্ণ ভ্রার্তৃত্বের বন্ধন নিয়ে একে অপরকে সাহায্য করবে। তার এ 'দান' প্রতিদান বিহীন থাকবে না বরং প্রত্যেক দাতা আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবে। ধনীরা ক্ষতির মুখে পড়বে না, ঠকবে না দরিদ্ররাও। দেশে দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাঁধবে না বরং তাদের পরোপাকারের ছায়া গোটা বিশ্বকেই ছেয়ে নেবে।

জাগতিক সব চেষ্টা-প্রচেষ্টার নানাবিধ ত্রুটি থেকে থাকে আরও থাকে বহুমুখী অপূর্ণতাও। অতএব, নব ব্যবস্থার প্রবর্তন সাধন করতে পারেন কেবল তারাই, যারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হোন।

তাদের মনে বিত্তবানদের প্রতি আক্রোশ থাকে না আর গরীবদের প্রতিও থাকে না কোন অন্ধ মায়া। তারা প্রাচ্যেরও নন, নন প্রতীচ্যেরও। তারা হলেন খোদা তা'লার বার্তাবাহক-মনোনীত জন। আর জগৎসমক্ষে তারা সেই শিক্ষাই উপস্থাপন করেন, যা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সত্য ও সঠিক পথ নির্দেশ করে। অতএব, বর্তমানেও সেই শিক্ষাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবে, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে বিশ্ব প্রাপ্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র সমীপে সকরুণ প্রার্থনা, তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর মমতাভরা তত্ত্বাবধানে আমাদেরকে শীঘ্র সেই শুভদিন দেখার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

সূচিপত্রে

৩১ অক্টোবর, ২০১৭

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	৬
এযালায়ে আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	১০
লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ **জুমুআর খুতবা**	১৩
নেদারল্যান্ডের নুনস্পিটস্থ মসজিদ বাইতুন নূর-এ প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৯ই অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	২১
বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	২৮
'আখলাকে আহমদ' অর্থাৎ 'আহমদ'-এর চারিত্রিক গুণাবলী মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান	৩০
ইসলাম: বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পথিকৃৎ মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	৩৪
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	৩৬
আমি কিভাবে আহমদী হলাম মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী	৩৮
জনকের প্রতি এক আত্মজের বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ সুলতান আহমদ	৪০
সংবাদ	৪২
বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক	৪৭
মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী	৪৮

প্রচ্ছদ পরিচিতি:

বায়তুস্ সালাম, সেইন্ট প্রিক্স, ফ্রান্স। পাশ্চাত্যের এ স্থান থেকে কিছুকাল পূর্বেও ইসলাম বিরোধী বাক্যবাণ শোনা যেত, আর আজ সেখান থেকেই উচ্চকিত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে তওহীদের শান্তিবিস্তারী অমিয় বাণী।

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন–
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝٧

৭। এরপর আমরা আবারো তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয় দান করলাম এবং আমরা ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করলাম আর আমরা তোমাদেরকে (আগের চেয়ে)[১৫৯৪] এক বড় জনগোষ্ঠীতে পরিণত করলাম।

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۖ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝٨

৮। তোমরা সদাচরণ করলে তোমরা নিজেদের কল্যাণ সাধন করবে এবং তোমরা অসদাচরণ করলে তা তোমাদের (নিজেদেরই) বিরুদ্ধে যাবে। অতএব পরবর্তী যুগের প্রতিশ্রুত সময় যখন আসবে তখন তারা তোমাদের লাঞ্ছিত[১৫৯৪-ক] করবে এবং তারা ঠিক সেভাবেই মসজিদে প্রবেশ করবে যেভাবে সেখানে তারা প্রথমবার করেছিল এবং যা কিছুর উপরই[১৫৯৫] তারা বিজয় লাভ করবে তা তারা সম্পূর্ণরূপে ছারখার করে দিবে।

১৫৯৪। নির্বাসনে ইহুদীরা উন্নতি করতে থাকে। তাদের অধিকাংশকে কেন্দ্রীয় ব্যাবিলনিয়াতে জাতীয় কাজে নিয়োগ করা হলো এবং তাদের অনেকেই পরিণামে স্বাধীনতা অর্জন করলো এবং মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলো। তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুরাগ পুনর্জীবিত হলো, ইতিহাস থেকে জ্ঞানার্জন করলো, তা পুন: সম্পাদনা করলো এবং জাতীয় পুনর্জীবনের উপযোগী করে রচনা করলো এবং প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধারের আশা-আকাঙ্খা পোষণ ও প্রচার করতে লাগলো। প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫ সালে তাদের এ উচ্চাকাঙ্খা আরো নিশ্চিতরূপ পরিগ্রহ করলো। ইহুদীরা মিদিয়া ও পারশ্য সম্রাট সাইরাস (Cyrus)-এর সাথে এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করলো এবং তাকে ব্যাবিলন জয় করতে সাহায্য করলো। নগরবাসীরা বিনা বাধায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালের জুলাই মাসে আত্মসমর্পণ করলো। ইহুদীদের এ কাজের পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট সাইরাস তাদের জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন এবং তাদের ধর্মীয় ইবাদতখানা পুনর্নির্মাণ করার জন্য সাহায্য করলেন (হিস্টরিয়ানস হিস্টরি অবি দি ওয়ার্ল্ড, ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা, যিউ এনসাইকো, ৭ম খণ্ড, জেরুযালেম অধ্যায়, এনসাইক বিব সাইরাস অধ্যায় এবং ২ বংশাবলী ৩৬:২২-২৩)। জুডিয়া শেষবাজার (সাইরাসের অধীনস্থ শাসনকর্তা) সেইসব সম্পদ মন্দিরের ধর্মযাজকের কাছে ফিরিয়ে দিল যা নেবুখদনিৎসর নিয়ে গিয়েছিল এবং রাজকোষের খরচে সব কিছু পুনঃস্থাপনের কাজ করে দিল। নির্বাসিতদের এক বৃহৎ দল জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তন করলো (ইস্রা-১:৩৫)। ইবাদতখানা পুনর্নির্মাণের কাজ নিয়মিত এগিয়ে চললো এবং তা খ্রিষ্টপূর্ব ৫১৬ সালে সম্পূর্ণ হলো। এসব ঘটনা এবং ইহুদীদের পরবর্তী উন্নতি সম্পর্কিত ঘটনাবলী এই আয়াতে বলা হয়েছে এবং এ সব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বেই এগুলো সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ-৩০:১-৫)।

১৫৯৪-ক। এর এই অর্থও হয় : 'তারা তোমাদের নেতাদেরকে অপমানিত করতে পারে।' 'উজুহুন' অর্থ নেতৃবৃন্দ (লেইন)।

১৫৯৫। এ আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির দ্বিতীয়বার পূর্ববর্তী পাপাচারের কুঅভ্যাসে পুনরায় লিপ্ত হওয়া এবং এর ফলে তাদের উপর নিপতিত আযাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নির্যাতন করেছিল এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং তাঁর প্রচার বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। অতএব আল্লাহ তা'লা ইহুদীদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত করেছিলেন যখন টাইটাসের রোমান সৈন্যবাহিনী ৭০ খ্রিষ্টাব্দে তাদেরকে দেশব্যাপী বিধ্বস্ত করেছিল। তীব্র ঘৃণা ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে জেরুযালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইবাদতখানা ভস্মীভূত করা হয়েছিল (এনসাইক, বিব, এর জেরুযালেম অধ্যায়)।

[টিকার অবশিষ্টাংশ ২০ পৃষ্ঠায়]

হাদীস শরীফ

তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর

কুরআন :

'আর হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা করে তাঁরই দিকে বিনীত হও। তিনি তোমাদের ওপর পর্যাপ্ত বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাবেন এবং তিনি তোমদের শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। আর অপরাধে লিপ্ত হয়ে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না। (সূরা হূদ: ৫৩)।

হাদীস :

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং গুণাহ্‌র জন্য মাফ চাও; আমি এক দিনে একশত বার তওবা করি (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। এ ভুলের জন্যে অনেক সময়ে অনেক বড় মাশুল দিতে হয়। অনেক ভুলের সংশোধন নেই। যার ফলে অনেকে জীবনভর উহার মূল্য দিতে থাকে। আধ্যাত্মিক জগতের অবস্থাও অনুরূপ। মানুষ যেহেতু দুর্বল, সেহেতু সে ভুল করে। কিন্তু পৃথিবীতে ক'জন আছে, যে নিজেকে দুর্বল বলে আখ্যা দেয়? এমন লোক খুব কমই আছে।

ইসলাম মানুষকে সর্বদা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্থিত করতে চেয়েছে। তাই ইসলাম মানুষকে ঐ সকল নির্দেশ দিয়েছে, যা তাকে উচ্চ আসনে সমাসীন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'লা তওবা করতে বলেছেন, ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে তওবা বা ক্ষমা চাওয়া ব্যতিরেকে উন্নতি করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যদি তোমরা তওবা কর তবে আমি তোমাদের সন্তান-সন্ততি, বৃষ্টি, ফসলাদি, দান করবো। অর্থাৎ এক কথায়, ক্ষমা চাওয়া একটি ফলদায়ক বৃক্ষ।

খোদার নিকট ক্ষমা চাওয়া শুধু যে গুনাহ্‌গারের জন্যেই, তা নয়। বরং সবাইকে চাইতে হবে। বলতে গেলে, ইস্তেগফার বা ক্ষমা না চাওয়া অহংকারের লক্ষণ। আর অহংকার এমন একটি পাপ, যা মানুষকে ধ্বংসের অতল-গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে এভাবে নসীহত করেছেন, 'হে আমার উম্মত! তোমরা ইস্তেগফার কর। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও। তোমরা আমাকে দেখো। আমিও দিনে সত্তর বার খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি'।

এখানে সত্তর অর্থ সত্তর নয় বরং অগণিত। হযরত নবী করীম (সা.)-এর মত নিষ্পাপ এবং আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত সত্তা যদি দিনে অগণিত বার খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে থাকেন, তবে আমাদের অবস্থা কী হওয়া উচিত? আমরা তো পাপে নিমজ্জিত। আমাদের তো সর্বদা ইস্তেগফারে নিয়োজিত থাকা দরকার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে যে শর্তে আমরা বয়আত হয়েছি, সেখানে এ শর্তটি রয়েছে যে, প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করবে এবং নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে। ইস্তেগফার মানুষকে বিনয়ী করে তুলে, মানুষকে অহং হতে মুক্ত করে। তাই আসুন, আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী দৈনিক ইস্তেগফার করি ও খোদার আশীষের অধিকারী হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

মন্দ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কি সাহায্য করেন?

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সুতরাং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, খোদা কি কখনো এই রীতি গ্রহণ করেছেন এবং যখন হতে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতে তিনি কি কখনো এরূপ কাজ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি এরূপ মন্দ স্বভাববিশিষ্ট ধূর্ত, অশিষ্ট এবং খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে এবং ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে খোদা তা'লার নামে মিথ্যা কথা বলে নিজের মনগড়া এক নতুন-ইলহাম বানিয়ে লোকদেরকে বলে বেড়ায় যে, খোদা তা'লার পক্ষ হতে এই ওহী অবতীর্ণ হয়েছে; আর খোদা তা'লা এরূপ ব্যক্তিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে শক্তিশালী নিদর্শনাবলী দ্বারা তাকে সাহায্য করেন? তার দাবী সপ্রমাণ করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আকাশে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগিয়ে দেন? অনুরূপভাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বের কিতাবসমূহে, কুরআন শরীফে, হাদীসসমূহে এবং স্বয়ং তার কিতাব বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ ছিল, তা পূর্ণ করে জগদ্বাসীকে দেখান? এবং সত্যবাদীর ন্যায় ঠিক শতাব্দীর শিরোভাগে তাকে প্রেরণ করেন? এবং ঠিকই ক্রুশের প্রাধান্যের সময়, যেটাকে খণ্ডন করার জন্য ক্রুশ ধ্বংসকারী প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন অবধারিত ছিল, তাকে এই দাবির সাথে দাঁড় করিয়ে দেন? এবং তার সমর্থনে দশ লক্ষের অধিক নিদর্শন দেখান? এবং পৃথিবীতে তাকে সম্মান প্রদান করেন? এবং পৃথিবীতে তার কবুলিয়ত বিস্তার করেন? এবং শত-শত ভবিষ্যদ্বাণী তার পক্ষে পূর্ণ করেন? এবং প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের জন্য নবীগণ কর্তৃক নির্ধারিত দিনে তাকে সৃষ্টি করেন? এবং তার দোয়া কবুল করেন? এবং তার বর্ণনায় প্রভাব সৃষ্টি করেন? একইভাবে তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন? অথচ তিনি জানেন, সে একজন মিথ্যাবাদী এবং অন্যায়ভাবে জেনে-বুঝে তাঁর প্রতি মিথ্যা ওহী আরোপ করে? তোমরা কি বলতে পার আমার পূর্বে খোদা তাআলা অন্য কোন মুফতারির (যে ব্যক্তি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলে) প্রতি এরূপ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছিলেন?

অতএব, হে খোদার বান্দারা! উদাসীন হয়ো না, যেন শয়তান তোমাদেরকে কুপ্ররোচণা না দেয়। নিশ্চিতভাবে জেনো, ঐ ওয়াদা পূর্ণ হল-যা আদি হতে খোদার পবিত্র নবীগণ করে আসছেন। খোদার প্রেরিত পুরুষগণ ও শয়তানের মধ্যে আজ শেষ-যুদ্ধ। এটি ঐ-সময় ও ঐ-যুগ, যার প্রতি দানিয়াল নবীও ইঙ্গিত করেছিলেন। আমি সত্যবাদীদের জন্য একটি আশিষরূপে এসেছি। কিন্তু আমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হয়েছে। আমাকে কাফের ও দাজ্জাল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এরূপ হওয়াই জরুরী ছিল, যাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে যায়, যা 'গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম' আয়াতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কেননা, খোদা **'মুনইম আলাইহিম'** এর ওয়াদা করে এই আয়াতে বলেছেন' এই উম্মতের মধ্যে ঐসব ইহুদীও সৃষ্টি হবে, যারা ইহুদী-আলেমদের সদৃশ হবে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা ঈসা (আ.)-কে কাফের, দাজ্জাল ও নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিল। এখন চিন্তা কর, এটি কোন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতের মধ্য হতে আগমন করবেন। এজন্য তার যুগে ইহুদী-স্বভাববিশিষ্ট মানুষও সৃষ্টি হয়ে যাবে, যারা নিজেদের আলেম বলবে। অতএব আজ তোমাদের দেশে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন আলেম যদি না থাকত, তাহলে এই সময়- কাল পর্যন্ত এই দেশের সব মুসলমান অধিবাসী আমাকে গ্রহণ করত। সুতরাং সকল অস্বীকারকারীর পাপ এদের ঘাড়ে চাপবে। এরা ন্যায়পরায়ণতার প্রাসাদে না নিজেরা প্রবেশ করছে, না স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন লোকদেরকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে। এরা কতই না ষড়যন্ত্র করছে! এদের গৃহে সংগোপনে কতই-না শলা-পরামর্শ করা হচ্ছে। কিন্তু এরা কি খোদার ওপর জয়যুক্ত হয়ে যাবে? এরা কি সর্বশক্তিমান খোদার ইচ্ছায় বাদ সাধতে পারবে, যার সম্বন্ধে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এরা এই দেশের খল-প্রকৃতির আমীরদের এবং হতভাগ্য ঐশ্বর্যশালী বস্তুবাদী লোকদের ওপর ভরসা করছে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে এরা কি? খোদার দৃষ্টিতে এরা মৃত কীট মাত্র।

['তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৯]

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৩য় খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

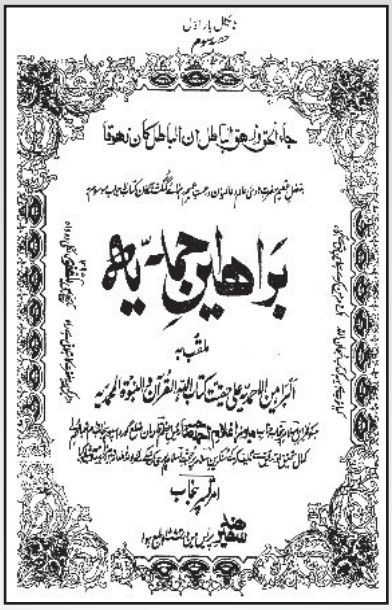

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

৭ম সন্দেহ: কোন একটি ঐশী গ্রন্থ ঐশী জ্ঞানের পুরো সত্য ভাণ্ডারকে আয়ত্ত করতে পারে না, তাই কী করে আশা করা যেতে পারে যে, অসম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে দেবে?

উত্তর: এই সন্দেহ বা কুমন্ত্রণা কেবল তবেই মনোযোগের যোগ্য গণ্য হতো, যদি ব্রাহ্ম সমাজীদের কেউ স্বীয় বুদ্ধির জোরে খোদাপ্রাপ্তি বা পারলৌকিক অন্য কোন বিষয়ে এমন কোন আধুনিক সত্য উদঘাটন করতো, যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই। এমন পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে ব্রাহ্ম বন্ধুরা বড় গর্বের সাথে বলতে পারতেন যে, পরলোক-সংক্রান্ত জ্ঞান এবং খোদা-সংক্রান্ত পুরো সত্যের উল্লেখ এলহামী গ্রন্থে নেই বরং অমুক অমুক সত্য বাদ পড়েছে যা আমরা আবিষ্কার করেছি। যদি এমনটি করে দেখাতো, তাহলে হয়ত কোন নির্বোধকে প্রতারিত করতে পারতো। কিন্তু যেখানে পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে দাবি করছে

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

(সূরা আল্ আনআম: ৩৯) অর্থাৎ খোদার জ্ঞান-সংক্রান্ত কোন সত্য এ গ্রন্থের বাইরে নয়, যা মানুষের জন্য আবশ্যক।

يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

(সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্: ৩-৪) অর্থাৎ খোদার রসূল পবিত্র গ্রন্থাদি পাঠ করেন, যাতে সকল প্রকৃষ্ট সত্য এবং পূর্ববর্তী-পরবর্তীদের সকল জ্ঞান তাতে বিধৃত রয়েছে। আবার বলেন,

كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

(সূরা হূদ:২) অর্থাৎ এ গ্রন্থের দু’টো বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য রয়েছে প্রথমত মূর্তিমান প্রজ্ঞা। সুদৃঢ় যুক্তিতে সুসজ্জিত করে অর্থাৎ প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জ্ঞানের আদলে আল্লাহ্ তা’লা এটি বর্ণনা করেছেন, কাহিনী বা গল্প-গাঁথা হিসেবে নয়। দ্বিতীয় সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য হলো, এতে পরলোক সংক্রান্ত জ্ঞানের সকল প্রয়োজনীয় দিক বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পুনরায় তিনি বলেন

اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

(সূরা তারেক: ১৪-১৫) অর্থাৎ পরলোক-সংক্রান্ত বিষয়ে যত বিতর্ক দেখা দিতে পারে এ গ্রন্থ তার প্রত্যেকটির মীমাংসা দিয়ে থাকে। এটি অলাভজনক বা অর্থহীন কিছু নয়। আবার তিনি বলেন

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

(সূরা নহল: ৬৫) অর্থাৎ আমরা এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যেন অসম্পূর্ণ বা দুর্বল বুদ্ধির ফেরে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে বা ইচ্ছাকৃত বাড়াবাড়ি অথবা ঔদাসীন্যের ফলশ্রুতি-স্বরূপ যা দৃশ্যপটে এসেছে তা দূরীভূত করে বিশ্বাসীদেরকে সঠিক রাস্তা দেখানো সম্ভব হয়। এখানে এ কথার

প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আদম-সন্তানের বিভিন্ন কথার মাধ্যমে যে বিশৃংখলা ছড়িয়েছে, তার সংশোধনও ঐশী বাণীর উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ সেই বিকৃতি, যা বাজে ও ভ্রান্ত কথা এবং বাজে মন্তব্যের জের হিসেবে জন্ম নিয়েছে, তার সংশোধনের জন্য এমন বাণী বা ধর্মীয় সাহিত্যের প্রয়োজন, যা হবে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। কেননা এটি স্পষ্ট একটি বিষয় যে, কোন কথার মাধ্যমে যে পথ হারায়, সে কেবল কালাম বা সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা বা কথার মাধ্যমেই পথে ফিরে আসতে পারে। নিছক প্রকৃতির অঙ্গুলি-নির্দেশ ধর্মীয় বিতণ্ডার অবসান ঘটাতে পারে না আর স্রষ্টকেও তার স্রষ্টতার জন্য সন্দেহাতীতভাবে দোষারোপ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারক যদি বাদীর সব কথা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ না করে আর বিবাদীর যুক্তিসমূহ সুনিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণাদির মাধ্যমে খণ্ডন না করে, তাহলে এটি কী করে সম্ভব যে, কেবল তার ইঙ্গিতে উভয় পক্ষ তাদের স্ব-স্ব প্রশ্ন, আপত্তি ও অভিযোগের উত্তর পেয়ে যাবে? এমন অস্পষ্ট ইঙ্গিত, যার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে কোন পক্ষের আপত্তির নিরসন হয় না, তা কী করে চূড়ান্ত কথা হতে পারে? অনুরূপভাবে খোদার যুক্তি-প্রমাণ বান্দাদের কাছে কেবল তখনই পূর্ণ প্রমাণ বলে গণ্য হবে, যদি ভ্রান্ত সব বক্তৃতার প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত-বিশ্বাসে নিপতিত লোকদেরকে সঠিক ও উৎকৃষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয় আর যুক্তিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে তাদের স্রষ্টতা তাদের সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়, যেন জানার পরও যারা বিরত হয় না আর ভ্রান্তি পরিত্যাগ করে না তারা শাস্তিযোগ্য আখ্যা পায়। কোন ব্যক্তিকে খোদা তা'লা অপরাধী চিহ্নিত করে ধৃত করবেন এবং শাস্তি দিতে উদ্যত হবেন কিন্তু স্পষ্ট যুক্তির মাধ্যমে সে ব্যক্তির নিরপরাধী হওয়ার যুক্তিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবেন না, আর তার মনের সন্দেহ-সংশয়কে পরিষ্কার যুক্তির মাধ্যমে দূরীভূত করবেন না- এটি কী তাঁর ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত হতে পারে? আবার এরই দিকে দ্বিতীয় আয়াতে ইঙ্গিতও করেছেন

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

(সূরা আল বাকারা: ১৮৬) অর্থাৎ কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত যে ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তার প্রতি পথনির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত জ্ঞানের যেসব দিক প্রথমে কিছুটা সংক্ষিপ্ত-রূপে চলে আসছিল, তা বিশদরূপে বর্ণনা করে। তৃতীয়ত যে সকল বিষয়ে মতভেদ ও বিতণ্ডা দেখা দিয়েছিল, সেসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ করে। আর এই সম্পূর্ণতা সম্পর্কে বলেন,

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا

(সূরা বনী ইস্রাঈল: ১৩) অর্থাৎ এ গ্রন্থে সকল প্রকার ধর্মীয় বিষয়াদি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের আংশিক নয় বরং পূর্ণাঙ্গীন উন্নতি হয়, কেননা এটি সে সকল মাধ্যম বাতলে দেয় এবং এমন সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করে যার মাধ্যমে পুরোপুরি উন্নতি সাধন হয়। পুনরায় বলেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

(সূরা আন্ নাহল: ৯০) অর্থাৎ ধর্মীয় সকল সত্য কথা স্পষ্ট করার জন্য আমরা তোমার প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি আর যেন আমাদের এই স্পষ্ট বিবরণ খোদার আনুগত্যকারীদের জন্য পথনির্দেশনা ও আশীর্বাদের কারণ হয়। পুনরায় বলেন–

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

(সূরা ইব্রাহীম: ২) অর্থাৎ তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে প্রবিষ্ট করাবে, এ উদ্দেশ্যেই আমরা তোমার প্রতি আমাদের এই মহা মর্যাদাশীল গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের মনে যেসব কুমন্ত্রণা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয় কুরআন এর প্রত্যেকটি দূরীভূত করে, সকল প্রকার রুগ্ন ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটায় এবং উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের আলো দান করে। অর্থাৎ খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যে পরিমাণ জ্ঞান ও তত্ত্ব লাভ হওয়া প্রয়োজন, তার সবই দান করে। পুনরায় বলেন–

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

(সূরা ইউসুফ: ১১২) অর্থাৎ কুরআন এমন গ্রন্থ নয় যা মানুষ রচনা করতে পারে, বরং এর সত্যতার লক্ষণ স্পষ্ট। কেননা তা পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীকে সত্য প্রমাণ করে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর যে সকল সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সেসব কিতাবে স্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান ছিল না, কুরআন এর প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছে আর সেসবের শিক্ষাকে পরম মার্গে পৌঁছিয়েছে। সেইসাথে এসব গ্রন্থকে এমনভাবে সত্য প্রমাণ করেছে, যার মাধ্যমে এর নিজের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এর সত্যতার দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, এটি সকল ধর্মীয় সত্য বর্ণনা করে আর সে সকল বিষয় উপস্থাপন করে যা পূর্ণ হিদায়াত পাওয়ার জন্য আবশ্যক। মানুষের জ্ঞান এতটা ব্যাপক ও সর্বব্যাপী হওয়া যে, কোন ধর্মীয় সত্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব এর বাইরে থাকবে না– এটি মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে; আর এই নিরিখেই এটি কুরআনের সত্যতার নিদর্শন সাব্যস্ত হলো। এক কথায় এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, কুরআন শরীফ পূর্ণ সত্যের সমাহার আর এর সত্যতার এটিই মহান প্রমাণ। এ দাবির পর শত শত বছর কেটে গেছে, আজ পর্যন্ত ব্রাহ্ম প্রমুখরা এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখ খুলতে পারে নি। উন্মাদ ও পাগলের ন্যায় অনর্থক ও অমূলক সন্দেহ প্রকাশ করা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, সরল-প্রাণ ও সৎ লোকদের মত এমন লোকদের সত্যের

সন্ধান করা আদৌ পছন্দ নয়, বরং অবাধ্য প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা কোনভাবে খোদার পবিত্র শিক্ষা বরং খোদা হতেই অব্যাহতি লাভ করার ফন্দি-ফিকিরে মগ্ন। এই স্বাধীনতা কুক্ষিগত করার জন্য খোদার সত্য কিতাব যার সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট, তা থেকে এরা এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে যে, বক্তা হিসেবে ভদ্রতার সাথে কথাও বলে না আর শ্রোতা হিসেবে অন্য কারও কথাও শোনে না। কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করুক এমন কে আছে, যে কোন সময় কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন ধর্মীয় সত্য উপস্থাপন করেছে, যার কোন উত্তর কুরআন দেয় নি বরং খালি হাতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে? কুরআন যেখানে ১৩০০ বছর ধরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবি করে আসছে যে, এটি সকল ধর্মীয় শাশ্বত সত্যে সমৃদ্ধ, সেখানে যাচাই না করেই এমন সুমহান গ্রন্থকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা নোংরা প্রকৃতিরই পরিচায়ক। আর এটি কেমন অহংকার যে, কুরআন শরীফের বিবৃতি গ্রহণ করে না অথচ এর দাবিও খণ্ডন করে দেখায় না। সত্য কথা হলো, এদের মুখে কখনও কখনও খোদার উল্লেখ এসেই যায় কিন্তু তাদের হৃদয় জাগতিক নোংরামিতে কলুষিত। কোন ধর্মীয় বিতর্ক আরম্ভ করলেও পুরোপুরি এর সমাপ্তি টানতে চায় না, বরং তড়িঘড়ি সকল অসমাপ্ত আলোচনার অপমৃত্যু ঘটায়, পাছে সত্য না আবার প্রকাশ পেয়ে যায়। এছাড়া লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে, ঘরে বসে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থকে দুর্বল আখ্যা দেয়, যা অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে বলেছে

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

(সূরা আল্ মায়েদা: ৪) অর্থাৎ আজ আমি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করে ধর্মীয় জ্ঞানকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়েছি আর বিশ্বাসীদের জন্য স্বীয় সকল নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছি। হে লোক সকল! তোমরা কী আদৌ খোদাকে ভয় কর না? চিরকাল কি এভাবেই বেঁচে থাকবে? এই মিথ্যা চেহারার ওপর একদিন কী অভিশাপ নেমে আসবে না? আপনারা যদি কোন বড় মানের প্রমাণ নিয়ে বসে থাকেন, যা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা হলো, আপনারা হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সুগভীর গবেষণা করে তা সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের মিথ্যা ধারণা অনুসারে কুরআন শরীফ সেই সত্য উপস্থাপনে ব্যর্থ! তাহলে দোহাই! সকল ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার করে সেই সত্য আমাদের সামনে উপস্থাপন কর যেন আমরা কুরআন শরীফ থেকে তা বের করে তোমাদেরকে দেখাতে পারি। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে তোমাদের মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি এখনও আপনারা কুধারণা পোষণ ও বাগাড়ম্বর পরিহার না করেন আর ধর্মীয় বিতর্কের সঠিক পন্থা অনুসরণ না করেন, তাহলে এছাড়া আর কী বলব যে, লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।

১. হে মিথ্যা অপবাদ আরোপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি, সাবধান! নির্লজ্জ আচরণের মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করো না

২. খোদার মনোনীত বান্দাদের সাথে তুমি কতদিন শত্রুতা প্রদর্শন করবে? বিশ্বপ্রতিপালকের সামনে তোমার কোন সময় তো অন্ততপক্ষে লজ্জা করা উচিত

৩. যদি কোন জিনিস অনেক উন্নত প্রমাণিত হয় (উজ্জ্বল) তাহলে এর উপর তোমার অপবাদ আরোপ করা নির্বুদ্ধিতার শামিল।

৪. যদি তুমি কোন নেক মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ কর তাহলে মানুষ বুঝবে যে, তুমি নিজেই মূলত পাপিষ্ঠ।

৫. পাক পবিত্রকে যদি তুমি ধুলিমলিন আখ্যা দাও তাহলে এর মাধ্যমে তোমার চোখের ঝাপসা হওয়াই প্রকাশ পাবে।

৬. নোংরা, অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন কথা-বার্তার সবই নোংরাদের নোংরামিরই প্রমাণ

৭. তুমি মিথ্যা কথা ছাড়া আর কিছুই বলতে জান না কিন্তু সত্যের সামনে মিথ্যা উন্নতি করতে পারে না।

৮. তুমি অনন্য খোদাকে স্মরণ কর না অর্থহীন পৃথিবীই তোমার প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে

৯. এই পৃথিবীকে মানুষ কেন ভালোবাসবে কেননা একদিন হঠাৎ এই ক্ষণস্থায়ী স্থানকে ছেড়ে যেতে হবে।

১০. এই গৃহের পরিণাম দুঃখ ও বেদনা ছাড়া আর কিছু নয়, সুপুরষরা তার ছলনায় পা দেন না ।

১১. ইতরদের ন্যায় এই কাদার মাধ্যমে হৃদয়কে কলুষিত করবে না কেননা এর জীবন অনেক বেশী দীর্ঘ নয়।

১২. শাস্তি-পুরস্কারের সময় ঘনিয়ে আসছে ইহজাগতিক জীবন নিয়ে এত অহংকার করো না

১৩. স্বর্ণ, রৌপ্য ও সম্পদের চাকচিক্যে প্রতারিত হবে না কেননা সকল সম্পদ চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষয়মান-লয়শীল

১৪. আমরা কিছু সাথে আনি নি আর সাথে নিয়েও যাবো না। আমরা রিক্ত হস্তে এসেছি আর রিক্ত হস্তেই চলে যাব

১৫. সাবধান বন্ধুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে না সমগ্র বিশ্বজগত বন্ধুর একটি চুলের সামানও নয়।

১৬. সেই খোদা যার জন্য আমাদের প্রাণ নিবেদিত তাঁর পথ তুমি মুস্তফার অনুসরণ ছাড়া পেতে পার না।

১৭. আবুল কাসেম বিশ্বের সেই জ্যোতি যার মাধ্যমে পৃথিবী ও সকল যুগ আলোকিত হয়ে গেছে।

১৮. মুহাম্মদ (সা.) এর মত মানুষ যদি সৃষ্টি না হতেন তাহলে মানুষ যে ফিরিশতার চেয়ে উত্তম তা কোনভাবে প্রমাণিত হতো না।

১৯. খোদার সামনে কি তোমার লজ্জা হয় না? কেননা তুমি বুদ্ধিমান ও সম্মানিত।

২০. তা সত্ত্বেও তুমি সেই রসূলকে অস্বীকার কর যার কল্যাণে বিবেক তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি লাভ করে।

২১. তুমি ভ্রান্তি ও ঔদাসীন্য হতে মুক্ত হও নাই, মানবীয় অভ্যাস ও রীতিনীতি থেকে তুমি মুক্ত হও নাই।

২২. খোদার কাজ করা তোমার জন্য সম্ভব নয়, অজ্ঞতা ও শত্রুতাবশত ঝগড়া করো না।

২৩. খোদাকে জড়বস্তুর ন্যায় দুর্বল ও বোবা মনে করো না আর তাঁর পরাকাষ্ঠাকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেল না।

২৪. তুমি স্বয়ং অসম্পূর্ণ, ইতর ও হীন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; সুতরাং পবিত্র সত্তাকে ত্রুটির দোষে দোষারোপ করো না।

২৫. বাজে ধ্যান-ধারণা তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তুমি স্বয়ং হেঁটে গিয়ে কুঁয়ায় পড়েছ।

২৬. তোমার ধ্যান-ধারণা অন্ধকার রাতের ন্যায় তমসাচ্ছন্ন সেই রাতের উপর ওপর তোমার বিদ্বেষ আরও ধূলালেপন করেছে।

২৭. হৃদয়কে চোরদের ন্যায় রাত নামার কারণে আনন্দিত করো না বরং ভয় কর আর শাস্তির দিনকে স্মরণ কর।

২৮. যদি তুমি পাখিদের ন্যায় বাতাসে উড় এবং পানিতে সাতার কাট,

২৯. এবং আগুন হতে নিরাপদে বেরিয়ে আস আর যাদুর মাধ্যমে মাটিকে স্বর্ণও বানিয়ে দাও,

৩০. তুমি আদৌ সত্যকে পরাস্ত ও ব্যর্থ করতে পারবে না, সুতরাং উন্মাদ ও নেশাগ্রস্তদের ন্যায় অপলাপ করো না।

৩১. যাকে খোদা উজ্জ্বল সূর্য বানিয়েছেন সে তোমার হাতে তুচ্ছ মাটিতে পরিণত হতে পারে না।

৩২. হে ইতর! নিজের হৃদয়কে অনর্থক জ্বালিও না বর্ধমান জিনিস তোমার ধূর্ততার জোরে হ্রাস পেতে পারে না।

৩৩. বসন্তকাল আর প্রভাব সমীরণ, গোলাপ ও চামেলী ফুলের সাথে বাগানে নৃত্য করে চলেছে।

৩৪. নাসরীন ও বসন্তের অন্যান্য ফুলের সৌরভে সুরভিত মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

৩৫. হে নির্বোধ! তুমি সকল পাতা হারিয়ে, নিরবলম্বদের ন্যায় ঝরাতে (হেমন্তকাল) নিস্ব পড়ে রয়েছ।

৩৬. শত্রুতাবশত কুরআনের ওপর কেন হামলা করছ? তুমি কি কুরআনে কোন ভাল কথা দেখ নি?

৩৭. যদি পৃথিবীতে কুরআন না আসতো তাহলে পৃথিবীতে একত্ববাদের নামও থাকত না।

৩৮. পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এর মাধ্যমে সকল দেশ আলোকিত হয়েছে।

৩৯. এর মাধ্যমে একত্ববাদের পথ প্রকাশিত হয়েছে। তুমিও অবগত হয়েছ যে, তিনি অনন্য খোদা।

৪০. নতুবা তোমার পূর্বপুরুষদের অবস্থা দেখ, ইনসাফের সাথে তাদের ধর্ম ও মাযহাবের প্রতি লক্ষ্য কর।

৪১. সে ব্যক্তি ইতর ও পাপিষ্ঠ হয়ে থাকে যে স্বীয় অনুগ্রহকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

৪২. সাধ্যের বাইরে উড়ার চেষ্টা করো না যদি দক্ষতা না থাকে তাহলে ডাক্তার সাজার চেষ্টা করো না।

৪৩. নিশ্চিত জেনো এটি খোদার কাজ মানবীয় প্রচেষ্টার এতে কোন ভূমিকা নেই।

৪৪. আল্লাহর কৃপায় এ ধর্ম বড় মহিমান্বিত, প্রতারণা, ধোঁকা ও জোর জবরদস্তিমূলক কোন কাজ নয়।

৪৫. এর আলো সূর্যের ন্যায় দিপ্তিমান কিন্তু চোখের পর্দার কারণে তুমি দেখতে পাও না।

৪৬. হৃদয়ের নোংরামির বশে তুমি সন্দেহ পোষণ করো না, যদি তোমার কোন পরিষ্কার যুক্তি থাকে তবে তা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন কর।

৪৭. আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর এরপর সর্বশক্তিমান খোদার শক্তি দেখ

৪৮. তুমি তোমার জাতি থেকে একটি দল নির্বাচন কর যেন আমরা এক-অভিন্ন কথায় এক দেহ-তুল্য হয়ে যেতে পারি।

৪৯. খোদার মহান অনুগ্রহ আমাদের সাথে আছে আমরা মিথ্যা পূজারীদের ভয় করি না।

৫০. আমার হৃদয়ে এক-অদ্বিতীয় খোদার কল্যাণধারার একটি উচ্ছ্বাস বিরাজমান, আমি সকল সন্ধানীর পায়ের শিকল ছিন্ন করতে উদ্যত।

৫১. খোদার অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত এবং তাঁর অনুগ্রহের মৃদুমন্দ সুরভিত বাতাস বইছে।

৫২. যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকে লঙ্ঘন করে সে কীভাবে সত্য ও সততার মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাতে পারে?

৫৩. খোদার বাণী সদা স্বীয় সম্মান ও প্রতাপের সাথে তার নির্লজ্জ মুখে কালিমা লেপন করছে

৫৪. সেই ব্যক্তির মতামতের কী-বা মূল্য থাকতে পারে যাকে তার প্রবৃত্তির তুফান পরাভূত করে রেখেছে?

৫৫. হৃদয়ের পবিত্রতা এবং চিন্তাধারার প্রখরতা, দুটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য যা একসাথে কাজ করে বা যার একটি অন্যটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

৫৬. যখন আমরা আমাদের হৃদয়ে পবিত্রতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করি তখন এটিকে সেই কালির সাথে মিশ্রিত করি যা চোখ থেকে উৎসারিত হয়।

৫৭. খোদা তোমাকে একমুষ্ঠি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন আর তিনি স্বয়ং তোমাকে খাবার দিয়েছেন যেন তুমি কোথাও ধ্বংস না হয়ে যাও।

৫৮. তোমার সকল চাহিদা পূরণের তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন আর অনুগ্রহবশত তাঁর উদারতার উভয় হাত তোমার জন্য খুলে দিয়েছেন,

৫৯. তুমি কি তাঁর দানের প্রতিদান এভাবে দিচ্ছ যে, নিজের ধারণা অনুসারে তুমি তাঁর সমকক্ষ সেজে বসে আছ?

৬০. তুমি নিজেকে কীভাবে খোদার সমকক্ষ মনে করতে পার? এমন বুদ্ধি, বিবেক ও মতামতের জন্য পরিতাপ।

৬১. খোদা যখন কোন হৃদয়কে লাঞ্ছনার গহবরে নিক্ষেপ করেন আমরা তাকে নিজেদের চেষ্টায় তা হতে বের করতে পারি না।

৬২. আমরা চেষ্টা করি কিন্তু ফলাফল তাই হয় যা খোদার মতামত ও ইচ্ছা হয়।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

এযালায়ে আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৪৫তম কিস্তি)

(৬) প্রশ্নঃ প্রতিশ্রুত মসীহ্'র সাথে হাদীসাবলীতে কোথাও 'মসীল' ('সদৃশ') শব্দ পরিলক্ষিত নয় অর্থাৎ এমনটি কোথাও লেখা নেই যে, মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের মসীল বা সদৃশ আসবেন, বরং লেখা আছে, মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম আসবেন।

উত্তরঃ অতএব প্রণিধান করা আবশ্যক, খোদা তা'লা যখন আগমনকারী মসীহ্-সদৃশকে 'ইবনে-মরিয়ম' নামে অভিহিত করেছেন তখন আবার তিনি তাকে 'ইবনে-মরিয়ম সদৃশ' নামে কেনই-বা উল্লেখ করতেন? উদাহরণস্বরূপ, আপনারা ভেবে দেখুন, যারা তাদের সন্তানদের নাম মূসা, দাউদ ও ঈসা ইত্যাদি রেখে থাকেন, যদিও তাঁদের উদ্দেশ্য এর পেছনে এটিই হয়ে থাকে, তারা যেন পুণ্যে এবং কল্যাণ ও আশিসে উল্লিখিত নবীদের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে তাঁরা আবার তাঁদের সন্তানদের এমন করে ডাকেন না, 'হে মূসা-সদৃশ! হে দাউদ সদৃশ! হে ঈসার সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি! বরং আশিস ও কল্যাণ প্রত্যাশাস্বরূপ তাদের আসল নামেই ডাকা হয়। অতএব যে-কাজটি মানুষ কেবল আশিস ও কল্যাণ প্রত্যাশাস্বরূপ করতে পারে, সেটি কি সর্বশক্তিমান খোদা (কার্যতঃ) করতে সক্ষম নন? তিনি কি একজনের আধ্যাত্মিক অবস্থা অন্য এক জনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে সে-নামেই তাকেও অভিহিত করতে পারেন না? তিনি কি এরকম সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক অবস্থার কারণেই হযরত ইয়াহ্ইয়াকে এলিয়া নামে অভিহিত করেন নি? অনুরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থার সাদৃশ্যের কারণেই কি হযরত মসীহ-ইবনে-মরিয়মকে তৌরাতে দ্বিতীয় বিবরণ: ৪৯তম অধ্যায়ে 'শীলা' নামে অভিহিত করা হয়নি? 'শীলা' ইহুদা বিন ইয়াকুব (আ.)-এর পৌত্রের নাম ছিল। ইহুদাকে উল্লিখিত অধ্যায়ে মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের আগমনের এ ভাষায় সুসংবাদ দেয় হয়: 'ইহুদা থেকে রাজত্বের যষ্ঠি 'শিলা' না আসা পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।' অর্থাৎ 'ইবনে-মরিয়ম না আসা পর্যন্ত ছিন্ন করা হবে না'। একথা বলা হয় নি, মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম যেহেতু সেই পরিবার বা বংশ থেকে জন্মলাভ করার কারণে ইহুদার পৌত্রই ছিলেন, সেহেতু তাঁকে 'শিলা'র নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তৌরাতে উল্লিখিত অধ্যায়ের ১৫তম শ্লোকে হযরত ইয়াকুবের (আ.) এ দোয়ার উল্লেখ রয়েছে: 'তিনি ইউসুফের জন্য কল্যাণ কামনা করেন এবং ইউসুফের পুত্রদের জন্য দোয়া চেয়ে বলেন, 'সেই খোদা যিনি আজ পর্যন্ত সারা জীবন জুড়ে আমাকে দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন তিনি এই যুবকদের কল্যাণমন্ডিত করুন এবং আমার ও আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের নামে এদের অভিহিত করুন।" (অর্থাৎ তাঁদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্টপূর্ণ অবস্থা ও মর্যাদা এদেরও দান করুন– অনুবাদক)।

অতএব আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর চিরন্তন এই রীতি অনস্বীকার্য যে তিনি রূহানী সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের কারণে একজনের নামে আরেকজনকে অবিহিত করে থাকেন। ইব্রাহীমি স্বভাব-চরিত্রসম্পন্ন বক্তি তাঁর দৃষ্টিতে ইব্রাহীম ও মূসাসুলভ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টিতে মূসা এবং ঈসার স্বাভাব ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টিতে ঈসা বটে। আর যিনি উল্লিখিত সকলের আধ্যাত্মিক গুণ ও স্বভাব-চরিত্রে অংশীদার, তিনি (আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে) এই সমুদয় নামের প্রতীক এবং এই যাবতীয় নামেই অভিহিত। বিতর্কের বিষয় থাকলে সেটি এই যে, 'ইবনে-মরিয়ম' শব্দটিকে এর বাহ্যিক ও দ্রুতবোধগম্য অর্থ থেকে সরিয়ে কেন অন্য অর্থে গ্রহণ করা হবে? এর উত্তর হলো জোরালো যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে। কেননা কুরআন করীম ও পবিত্র হাদীস-নববী সুস্পষ্টত সজোরে

ঘোষণা করছে যে, হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেছেন এবং সম্মানে আল্লাহ্‌র দিকে উত্থিত তথা তার সান্নিধ্যে উন্নীত হয়েছেন এবং তাঁর পরলোকগত ভাইদের সাথে মিলিত হয়েছেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর মহতী মি'রাজের রাতে শহীদ নবী ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর সাথে তাঁকে দ্বিতীয় আকাশে প্রত্যক্ষ করেছেন। কুরআন করীম ও সহীহ্ হাদীসাবলী বরাবর এ সুসংবাদ দিচ্ছে যে, ঈসা-ইবনে-মরিয়মের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি এবং অন্যান্য নবীর সদৃশগণও আবির্ভূত হবেন। কিন্তু কোনো জায়গায় এটা লেখা নেই যে, কোনো বিগত ও পরলোকগত নবীও দুনিয়ায় পুনরায় আসবেন। কাজেই একথা স্বতঃস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, 'ইবনে মরিয়ম' দ্বারা আল্লাহ্‌র নবী ঈসা-ইবনে-মরিয়মকে বুঝায় না যিনি মারা গেছেন এবং পরলোকগতদের দলভুক্ত হয়েছেন।

খোদা তা'লার এ বিস্ময়কর হিকমতপূর্ণ বিষয়টির দিকেও লক্ষ্য করুন, আজ থেকে প্রায় দশ বছর পূর্বে তিনি আমার নাম 'ঈসা' রাখেন। এবং তাঁর পরম অনুগ্রহক্রমে বারাহীনে-আহমদীয়া গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এক জগৎ জুড়ে উল্লিখিত নামটির প্রসার ও প্রসিদ্ধি দান করলেন। এ সুদীর্ঘকাল পর এখন তিনি তাঁর বিশেষ ইলহামের মাধ্যমে প্রকাশ করেলেন যে, এ ব্যক্তি সেই ঈসা, কুরআন ও হাদীসে যার আগমনের প্রতিশ্রুতি ছিল। দশ বছর- কালব্যাপী মানুষ এ নামটি বারাহীন গ্রন্থে পড়তে থাকে। আর দশ বছরকাল যাবৎ আল্লাহ্ তা'লা সেই প্রথম ইলহামের ব্যাখ্যা স্বরূপ অবতীর্ণ এ দ্বিতীয় ইলহামটি গোপন রাখলেন, যাতে করে তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কার্যাবলী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিতে বানোয়াটমুক্ত হিসেবে সাব্যস্ত হয়। কেননা বানোয়াট কখনও ধারাবাহিকভাবে এতো দীর্ঘায়িত হতে পারে না যার ভিত্তি এক দীর্ঘকাল পূর্বে রাখা হয়েছিল! **ক্বোতদাব্বারু ইয়া উলিল্ আবসার।'** (অর্থাৎ হে চাক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন– অনুবাদক)।

(৭) প্রশ্নঃ আপনার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে আরও 'মসীহ্ সদৃশ' আসবেন। তাদের মাঝে কি প্রতিশ্রুত কেবল একজনই– যিনি আপনি? না কি আগমনকারী সবাই প্রতিশ্রুত হবেন এবং কাদেরকে আমরা সত্য প্রতিশ্রুত হিসেবে মানবো?

উত্তরঃ অতএব জানা আবশ্যক, ইঞ্জিল ও সহীহ্ হাদীসাবলী অনুযায়ী 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' হিসেবে আবশ্যকীয় ভাবে যার আগমন নির্ধারিত ছিল তিনি তো তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর চিহ্নাবলীসহ এসে গেছেন আর আজ সে ঐশী-অঙ্গীকার পূর্ণতা লাভ করেছে যা খোদা তা'লার পবিত্র এ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে পূর্ব থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু কারও মনে যদি এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে এ সমাগত মসীহ্‌র অবস্থার সাথে কতক হাদীসে বর্ণিত বিষয় বাহ্যতঃ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হয় না, যেমন দামেস্ক সম্পর্কিত হাদীসটিতে সে-রকম বিষয়াবলী রয়েছে। তাহলে এর উত্তর এটিই যে, প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত এসব বিষয়ই 'ইস্তিআরা' বা রূপকাশ্রিত বর্ণনামূলক। কেননা কাশফে বা দ্বিব্যদর্শনমূলক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে উল্লিখিত রূপকতার প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ এগুলোতে (বাহ্যতঃ) যা বলা হয় (আসলে) তাতে বুঝায় অন্য কিছু। কাজেই উল্লিখিত এসব বিষয়কে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থের সাথে মিলাবার চেষ্টা করা বা উল্লিখিত চিহ্নগুলো বাহ্যিক ও আক্ষরিকভাবে কেন পুরো হলো না সে কারণে নিজেদেরকে দ্বিধা বা বিস্ময়ের আবর্তে নিক্ষেপ করা এক বড় ধরনের ভ্রম। অথচ এ কি সত্য নয় যে উল্লিখিত এসব হাদীসের ব্যাখ্যা করার সময় আমাদের বিপক্ষদেরকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে জটিল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। অতএব তাঁরা অতি কষ্টে ও লৌকিকতার সাথে সে সব ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, আগমনকারী হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মের এ 'উত্তম কাজ'টির কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দুনিয়ায় এসে শুকর বধ করবেন। লক্ষ্য করা আবশ্যক, এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলেমবৃন্দ হাদীসের শব্দাবলীকে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে অভ্যন্তরীণ ও রূপক অর্থের দিকে ঘোরানোর যে কত প্রয়াস পেয়েছেন! অনুরূপভাবে দাজ্জাল কর্তৃক কা'বা শরীফের তোয়াফ করার বিষয়টিতে বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থ থেকে সুদূর পরাহত ব্যাখ্যার প্রয়াস চালিয়েছেন। কাজেই অপর পক্ষ যদি হাদীস বর্ণিত এসব বিষয়ের 'তাভিল' তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকতেন তাহলে অবশ্যই আমাকেও তাঁরা তদ্রুপ ব্যাখ্যাকারী হিসেবে ভাবতে (বা আখ্যা দিতে) নির্দোষ সাব্যস্ত হতেন। কিন্তু এখন তারা নিজেরাই এ পথে পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রগামী হয়ে আমাকে কোন্ মুখে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করেন?! প্রকৃত সত্য হলো যে, কাশ্‌ফ বা দ্বিব্যদর্শনমূলক বর্ণনাসমূহ যেহেতু প্রকৃতপক্ষেই উপমা ও রূপকতাপূর্ণ হয়ে থাকে, সেহেতু পক্ষ বা বিপক্ষ কারও পক্ষেই এগুলোকে সর্বত্র বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 'লম্বা হাত' সম্পর্কিত হাদীস বাহ্যিকভাবে লম্বা হাত হিসেবে ধরে নেওয়ায় এ নির্দেশনা দিচ্ছে ও প্রমাণ করছে যে, উল্লিখিত এ সব কাশ্‌ফমূলক বর্ণনার ক্ষেত্রে 'বাহ্যিক অর্থের ওপর জোর দেবে না, অন্যথায় ধোকা খাবে।' কিন্তু তাঁদের কেউ-ই এ নির্দেশনাটি গ্রহণ করছেন না। যেমন কবরের আযাব সম্পর্কিত হাদীসসমূহে বেশির ভাগ এই বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় যে, কবরগুলোতে সমাহিত গুনাহগার হলে সেখানে সাঁপ, বিচ্ছু ও আগুন থাকবে। উল্লিখিত এসব হাদীসকে যদি বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করতে হয়, তাহলে এরকম কয়েকটি কবর খুঁড়ে সেগুলোতে সাঁপ-বিচ্ছু দেখিয়ে দিন।

এরপর আমি এও বলি, ভিন্ন কয়েকটি হাদীস যা আমাদের বর্তমান অবস্থার সাথে এখনও সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেগুলোকে যদি আক্ষরকি ও বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করা হয় তবুও কোনো ক্ষতি বা অসুবিধে নেই। কেননা হতে পারে যে, খোদা তা'লা কোনো সময়ে এ অধমের এমন একজন পরিপূর্ণ (সিদ্ধ) অনুসারীর মাধ্যমে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পুরো বাস্তবায়ন করবেন যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মনোনীত মসীহ্-সদৃশের

মর্যাদার অধিকারী হবেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পারেন যে, অনুসারীদের মাধ্যমে কোনো কোনো খিদমত সাধিত হওয়া প্রকৃতপক্ষে এমনই যে, সে-খিদমতগুলো যেন আমি নিজ হাতে সম্পন্ন করেছি। বিশেষত যখন কতিপয় অনুসারী 'ফানা ফিশ্-শাইখ' (গুরুতে আত্মোৎসর্গিত) অবস্থা অবলম্বনে আমারই রঙ ধারণ করবে, আমারই রঙে রঙিন হবে। আর খোদা তা'লার কৃপা আমাকে যেমন (মর্যাদা) দান করেছে সে রকম আশিসপূর্ণ আত্মিক মর্যাদায় প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ তাদেরও ভূষিত করে থাকবে– এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে তাদের কৃতকর্ম বা অবদান আমার নিজের বলেই গণ্য হবে। কেননা যে আমার পথে চলে সে আমার থেকে পৃথক নয়। যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যাবলী আমাতে আত্মবিলীন হয়ে সম্পন্ন ও সফল করে সে আমারই অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে সে (আমার) অঙ্গ বা শাখা স্বরূপ হওয়ার দরুন 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে শামিল। কেননা সে কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়। প্রতিবিম্বস্বরূপ সেও যদি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মসীহ্-সদৃশ্যের নাম পায় এবং প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হয় তাতেও কোন ব্যত্যয় বা অসুবিধা নেই। কেননা 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' যদিও একজনই, কিন্তু এই একজনের মাঝে একীভূত হয়ে সকলে প্রতিশ্রুতই বটে। কেননা তাঁরা একই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা এবং প্রতিশ্রুত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এক ও অভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে (পরস্পর) সম্পূরক হয়ে থাকেন। তোমরা তাদের পরিচয় তাদের ফলের মাধ্যমে পাবে।

স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার রসূল, নবী বা মুহাদ্দাস তথা বহুলরূপে ঐশীবাণী ও বাক্যালাপে ভূষিতদের সপক্ষে তাঁর যে-সব প্রতিশ্রুতি হয়ে থাকে সেগুলো কখনও প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণ হয় আর কখনও পরোক্ষভাবে সেগুলোর পূর্ণতা সাধিত হয়। হযরত মসীহ্-ইবনে-মরিয়মকেও সাহায্য ও বিজয় লাভের যে-সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলো তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণ হয় নি। বরং অন্য একজন নবীর মাধ্যমে পূর্ণ হয় তিনি হলেন সকল নবীগণের সরদার ও শীর্ষনেতা– অর্থাৎ আমাদের মনিব ও অভিভাবক 'খাতামুর-রুসুল' হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। তেমনি হযরত মূসা (আ.)-কে কিনান (তথা ফিলিস্তিন) বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বরং পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছিল, 'তুমি তোমার জাতিকে কিনানে নিয়ে যাবে এবং কিনান দেশের তুমি তাদের মালিক করে দেবে।" এ প্রতিশ্রুতি হযরত মূসার জীবদ্দশায় পুরো হতে পারে নি। যাত্রা পথেই তিনি মারা যান। কিন্তু বলা যাবে না যে, এখনও তৌরাতে লিপিবদ্ধ এ ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা হযরত মূসার মৃত্যুর পর মূসা সুলভ শক্তি ও আত্মিক ক্ষমতা তাঁর শিষ্য ও অনুসারী 'ইউশা'কে দান করা হয়, আর সে খোদা তা'লার আদেশে এবং তাঁরই আত্মিক প্রণোদনায় মূসার মাঝে হয়ে এবং মূসা সুলভ আকার ধারণে সেই কর্মসাধিত করে– যা মূসার কাজ ছিল।

অতএব খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সে মূসা ছিল। কেননা সে মূসার মাঝে হয়ে ও মূসার অনুবর্তিতায় ও আনগত্যে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গিত হয়ে এবং খোদা তা'লার থেকে মূসাসূলভ আত্মায় বলিয়ান হয়ে সে-কাজটি সমাধা করেছি। অনুরূপভাবে আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তৌরাতে বর্ণিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতে পুরো হতে পারে নি, বরং সেগুলো মহামান্বিত সেই খলীফাগণের মাধ্যমে পুরো করা হয়–যাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা ও অনুবর্তিতায় আত্মোৎসর্গিত ছিলেন। কাজেই আল্লাহ্-প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে যে- সব বিজয় ও অন্যান্য মহতী বিষয় ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে সংরক্ষিত থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে (ঐশী বিধানমতে) এমনটি কখনো অপরিহার্য বলে মনে করা যায় না যে, সে-সবগুলো সামগ্রিকভাবে তাঁরই মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বরং তাঁর পরম নিষ্ঠাবান অনুসারীগণ তাঁর হাত-পা-স্বরূপ বিবেচিত হয়ে থাকেন এবং তাদের সমস্ত চেষ্টা-প্রয়স ও কর্মকাণ্ড সেই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির দিকেই আরোপিত হয়ে থাকে। যেমন, একজন সেনাপতি যদি ভালোভালো সৈনিক এবং সুদক্ষ গবেষকদের সহায়তায় কোনো শত্রুকে গ্রেফতার বা হত্যা করতে সমর্থ ও সফল হয় তাহলে সেই সার্বিক কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ড তাঁর (তথা সেনাপতির) দিকেই আরোপ করা হয়। আর নির্দ্বিধায় বলা হয় যে, ওই সেনাপতি শত্রুকে গ্রেফতার করেছেন বা বধ করেছেন। এ রকম বলায় কে-ই-বা আপত্তি করতে পারে? অতএব এ বাগধারা যখন প্রচলিত ও সুবিদিত বিষয়, তখন এ ক্ষেত্রে এটি স্বীকার করতে কিসে দ্বিধা বা বাধা থাকতে পারে?! ধরুন, যদি মেনেও নেয়া হয় যে, কতক ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে সেগুলোর বাহ্যিক আকারে বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যকীয়, তাহলে একই সাথে এ-ও মেনে নেয়া উচিত যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ আবশ্য-অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে এবং এমন লোকদের হাত দিয়ে সেগুলোর পূর্ণতা সাধিত হবে যাঁরা পরিপূর্ণভাবে অনুবর্তিতা ও আনুগত্যের সব স্তরে আত্মোৎসর্গিত হওয়ার কারণে এবং 'আসমানী রূহ'-কে (নিজেদের মাঝে) ধারণ করার দরুন তাঁরা এ অধমের সত্তাস্বরূপই হবে। আর (বহু পূর্বে) বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ একটি ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীও উল্লিখিত বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত বহণ করছে। সে-ইলহামটি হচ্ছে: **'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা ও রাফিউকা ইলাইয়া ওয়া জায়িলুল্লাযিনা-ত্তাবূকা ফওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইওমিল কিয়ামাহ্** (অর্থ: হে ঈসা নিশ্চয় আমি তোমাকে (স্বাভাবিক) মৃত্যু দেব এবং আমার দিকে ওঠাবো আর যারা তোমার অনুসারী তাদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর কিয়ামতকাল অবধি প্রাধন্য দান করবো' –অনুবাদক)। ওই মসীহ্-কেও স্মরণ রাখ, যে এই অধমের ঔরসজাত বংশধরদের মধ্যকার হবে– যার নাম 'ইবনে-মরিয়ম'ও বটে। কেননা এ অধমকে (উল্লিখিত) বারাহীন গ্রন্থে 'মরিয়ম' নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জুমুআর খুতবা

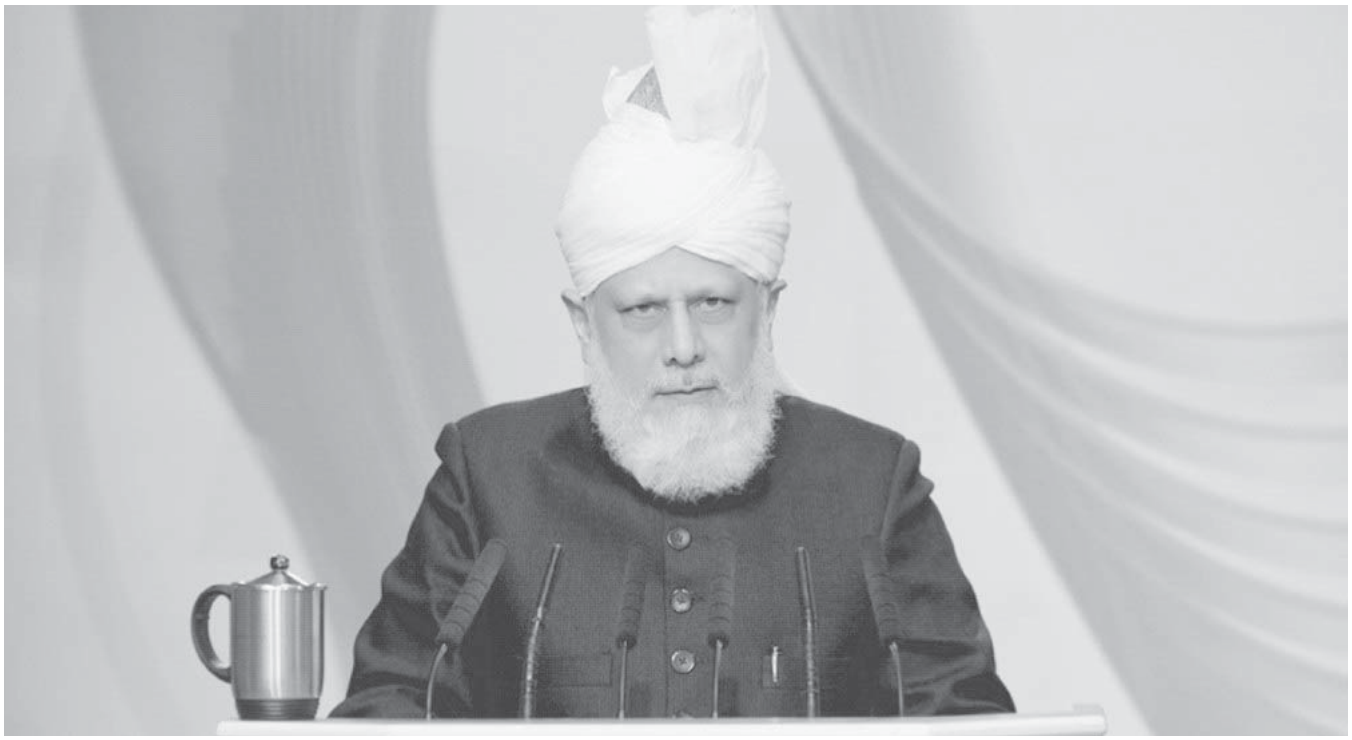

প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭, মোতাবেক ০৮তাবুক, ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

(সূরা আন-নাহল-১২৬)

এ আয়াতের অর্থ হলো, তোমার প্রভুর পথ পানে প্রজ্ঞা এবং উত্তম নসীহতের মধ্যমে আহ্বান কর। আর তাদের সাথেযুক্তিতর্কে সেই পন্থা অবলম্বন কর যা সর্বোত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাঁর পথ থেকে যে বিচ্যুত হয়েছে তাকে সর্বাধিক জানেন। আর হেদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের জামা'ত তাদের মজলিসে শূরায় এই প্রস্তাবটিকে রেখেছে এবং এ বিষয়ে অনেক ভালো আলোচনা করেছে আর সব জামা'তের মজলিসে শূরাইকীভাবে তবলীগের কাজকে এবং ইসলামের সত্যিকার বাণী স্ব-স্ব দেশের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজকে ব্যাপকতা দেয়া যায় অথবা এটিকে উত্তম ভিত্তির ওপর কীভাবে প্রতিষ্ঠিতকরা যায় সে বিষয়ে কর্মপন্থা প্রস্তাব করেছে? যুক্তরাজ্যের জামা'তও এ বছর তাদের মজলিসেশূরার আলোচ্যসূচিতেএ প্রস্তাবটি রেখেছিল। মজলিসে শূরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছে এবং আলোচনা করে স্বীয় কর্মপন্থা প্রস্তাব করে এবং আমার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই পরিকল্পনা তবলীগ-সংক্রান্ত হোক বা অন্য কোন কাজেরপরিকল্পনাই হোক না কেন, মজলিসে শূরা যখনই

প্রত্যেক পদাধিকারীর ওবিশেষ দা'ইয়ান ইলাল্লাহ্ বা প্রচারকারীদের কাজ করা উচিত। আমি বিশেষ দা'ইয়ানে ইলাল্লাহ্‌র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি এজন্য যে, তারা নিজেরাই নিজেদের নাম প্রস্তাব করেছেন যে, জামা'তের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে বেশি সময় ব্যয় করব। তারা যদি সময় দেন আর জ্ঞানও থাকে কিন্তু সেসব কথার প্রতি যদি দৃষ্টি না থাকে যা খোদা তা'লা বলেছেন, তাহলে এতে সেই আশিস ও কল্যাণ লাভ হতে পারে না, সেই উত্তম ফলাফল বের করা যাবে না যা প্রকাশ করা সম্ভব।

কোন পরিকল্পনা করে তখন শূরার সদস্যদের বিভিন্ন মতামত সামনে আসে আর তারা একটি মতামতে উপনীত হয় বা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি একটি মতৈক্যে পৌঁছে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপন্থা প্রস্তাব করে যুগ-খলীফার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। যখন অনুমোদন এসে যায় তখন নিজেদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা উজাড় করে এর ওপর আমল করা এবং করানো মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ এবং সকল পর্যায়ের জামা'তী কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব।

অতএব তবলীগের কাজে গতিসঞ্চার বা তবলীগি কর্মকাণ্ডকে আরো বিস্তৃত করার জন্য এই যে প্রস্তাব যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরায় আলোচিত হয়েছে ওএমর্মে যে সিদ্ধান্ত নেয়াহয়েছে বা পৃথিবীর যে দেশেই এটি নিয়ে পরামর্শ হয়েছে এবং যুগ-খলীফার কাছ থেকে অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের জন্য জামা'তসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা ও করানোর ক্ষেত্রে শূরার সকল সদস্য এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তার এখনসর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এটি মনে করবেন না যে, এ প্রস্তাবটি যেহেতু তবলীগ সংক্রান্ত তাই শুধু সেক্রেটারী তবলীগের ওপরইএটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তাবে অথবা অন্য কোন বিভাগ সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব হলে কেবল সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীই এর (বাস্তবায়নের) জন্য দায়ি (তা মনে করবেন না)। নিঃসন্দেহে এটিকে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীই দায়ী হবে কিন্তু বিশেষ করে তবলীগ এবং তরবিয়ত বিভাগ এমন যে, এ ক্ষেত্রে জামা'তের সকল পর্যায়ের পদাধিকারীর অংশগ্রহণ করা এবং নিজের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক।

এখন যেহেতু আমি তবলীগের প্রেক্ষাপটে কথা বলতে চাই তাই এই প্রেক্ষিতে আমি সর্বস্তরের কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, তারা স্ব স্ব জামা'তে এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়নের জন্য সেক্রেটারী তবলীগের সাথে যেন পূর্ণ সহযোগিতা করেন। নিজেরা এর অংশ হয়ে জামা'তের সদস্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। কোন ব্যক্তি যে পদেই থাকুন না কেন, কোন না কোনভাবে তারা তবলীগের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন। আর যদি ওহদাদার বা পদধারী অংশ নেয় তাহলে জামা'তের সদস্যদের সামনেও দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে আর অনেক আহমদী এমন থাকবে যারা না বলতেই বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াই এমন দৃষ্টান্ত দেখে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের প্রকৃত বাণী প্রচারে কাজে নিজে থেকেই ভূমিকা রাখতে পারবে। কোন কোন বিভাগের সেক্রেটারীর এমনিতেও কাজ ততবেশি হয় না। তারা সময়ও দিতে পারেন। শুধু নিয়্যত এবং সংকল্প ও সদিচ্ছার প্রয়োজন। যাহোক, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগের কাজ হলো, যে কর্মপন্থাই নির্ধারণ করা হয়েছে তা সব স্থানীয় জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগের কাছে পৌঁছানো। আর এ বিষয়টিও নিশ্চিত করুন যে, জামা'তের এই কর্মপরিকল্পনার যে দিকগুলোর (সাধারণ) সদস্যদের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যে অংশ প্রসাশনিক নয় বরং সাধারণ সদস্যের সাথে সম্পর্কিত, তা যেন প্রতিটি সদস্যের কাছে পৌঁছে যায়।

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি তাতে খোদা তা'লা আমাদেরকে যে দিকনির্দেশন দিয়েছেন তা বুঝার চেষ্টা করুন আর সে অনুসারে প্রত্যেক সেক্রেটারী তবলীগ, প্রত্যেক পদাধিকারীর ওবিশেষ দা'ইয়ান ইলাল্লাহ্ বা প্রচারকারীদের কাজ করা উচিত। আমি বিশেষ দা'ইয়ানে ইলাল্লাহ্‌র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি এজন্য যে, তারা নিজেরাই নিজেদের নাম প্রস্তাব করেছেন যে, জামা'তের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে বেশি সময় ব্যয় করব। তারা যদি সময় দেন আর জ্ঞানও থাকে কিন্তু সেসব কথার প্রতি যদি দৃষ্টি না থাকে যা খোদা তা'লা বলেছেন, তাহলে এতে সেই আশিষ ও কল্যাণ লাভ হতে পারে না, সেই উত্তম ফলাফল বের করা যাবে না যা প্রকাশ করা সম্ভব।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সেগুলোর মাঝে প্রথমটি হলো হিকমত অর্থাৎ প্রজ্ঞা।এরপর রয়েছে মাওইযাতিল হাসানা অর্থাৎ সুন্দরভাবে বোঝানো। এরপর বলা হয়েছে, যুক্তিতর্কের সময় এমন প্রমানাদি উপস্থাপন কর যা সর্বোত্তম। অধুনা কালের নামধারী আলেম এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠি ও সংগঠনগুলো নিজেদের উন্মাদনা এবং প্রজ্ঞা ও যুক্তিশূণ্য আর প্রমাণবিহীন কথার মাধ্যমে ইসলামকে এতটা দুর্নাম করেছে যে, অমুসলিম বিশ্ব মনে করে, ইসলাম প্রজ্ঞাশূণ্য, প্রমাণবিহীন ধর্ম আর নির্বোধ ও অজ্ঞদের ধর্ম। নাঊযুবিল্লাহ্। আর চরমপন্থাই হলো এ ধর্মের একমাত্র শিক্ষা। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'লার এ নির্দেশ বা বাণী অনুসারে তবলীগ করা এবং তবলীগের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সব আহমদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ

দায়িত্ব। অতএব এ দায়িত্বকে সর্বপ্রথম সর্বস্তরের ওহদাদার বা পদাধিকারীদের বুঝতে হবে। গত দু'এক বছরে এসব চরমপন্থি এবং কতিপয় আলেমেরকর্মকাণ্ড ইসলামকে এতটা দুর্নাম করেছে আর প্রচারমাধ্যমও এসব কথাকে এত ফলাও করে প্রচার করেছে যে,সম্প্রতি একটি জরিপ চালানো হয়েছে যাতে ইসলাম চরমপন্থি ও নির্দয় ধর্ম আর মুসলমানরা অপছন্দনীয় কি-না সেসম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, এতে সংখ্যারিষ্ঠের উত্তর এটিই ছিল যে, ইসলাম একটি চরমপন্থি ধর্ম আর মুসলমানরা ঘৃণ্য মানুষ। আমরা চাই না মুসলমানরা আমাদের দেশে বসবাস করুক আর এরা দেশের জন্য ক্ষতিকর। অথচ কয়েক বছর পূর্বেও এ সম্পর্কে যে জরিপ হয়েছিল তার ফলাফল এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি মুসলমানদেরকে ভালো মানুষ মনে করত। অতএব এমন পরিস্থিতিতে আমাদের পরিস্কার ধারণা জন্ম নেয়া উচিত যে, কতটা পরিশ্রম করে খোদা তা'লা বর্ণিত পন্থায় আমাদের তবলীগ করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তা হলো, হিকমত বা প্রজ্ঞার সাথে তবলীগ করা। হিকমত কাকে বলে? হিকমত শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক আর সফল তবলীগের জন্য হিকমতের এসব অর্থ আমাদের জানা থাকা আবশ্যক যেন তবলীগের ক্ষেত্রে আমরা এসব কথা দৃষ্টিপটে রাখতে পারি।

হিকমত শব্দের একটি অর্থ হলো, জ্ঞান। তবলীগ করার জন্য জ্ঞানও থাকা আবশ্যক। কেউ কেউ বলে বসে, আর এটি তাদের অজুহাত যে, আমাদের যেহেতু জ্ঞান নেই তাই আমরা তবলীগ করতে পারব না। বর্তমান যুগে এ অজুহাতও ধোপে টিকবে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সুন্দর যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ করেছেন আর জামা'তী সাহিত্যে এ জ্ঞান সবার জন্যসহজলভ্য করা হয়েছে যার ফলে সামান্য প্রচেষ্টাই মানুষকে যথেষ্টজ্ঞানগত দৃঢ়তা দান করে। এছাড়া প্রশ্নোত্তরের আকারে অডিও ভিডিও তথ্যাদি রয়েছে। সেইসাথে ওয়েব সাইটসমূহও রয়েছে। তবলীগ করার সময় অনেক অ-আহমদী অথবা অমুসলিম এমন আছে যারা বলে যে, আমাদের কাছে এখন দীর্ঘ বিতর্কের সময় নেই, এমন লোকদেরকে প্যাম্ফলেটও দেয়া যেতে পারে আর ওয়েব সাইটের ঠিকানাও দেয়া যেতে পারে। অনেকেই এমন থেকে থাকে যারা আগ্রহ রাখে, কিন্তু তাদের কাছে তাৎক্ষণিক সময় থাকে না, তারাপরে তথ্য সংগ্রহ করে। অনেক মানুষ নিজেরাই আমাকে জানিয়েছে যে, তারা এভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছে। অতএব প্রথমত নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে যেন যাদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হবে তাদের সাথে তাদের মান অনুযায়ী কথা বলা যায়। দ্বিতীয়ত এটি জানা থাকা উচিত যে, আমাদের বইপুস্তক এবং ওয়েব সাইটে কোথায় এ সব জ্ঞানগত উত্তর ও তথ্য রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে এবং নাস্তিকদের সাথে আলোচনার সময় তাদের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তিপ্রমাণ অনুসারে আমাদের যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

এরপর হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো, দৃঢ়ও পাকা কথা (আকরাবুল মাওয়ারেদ)। এমন যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন হওয়া উচিত যা নিজেই জোরাল এবং অকাট্য। এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণকে প্রমাণের জন্য আমাদের আরো যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে আর এরপর সেগুলোকেও প্রমাণ করতে হবে। অতএব দীর্ঘ বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আপত্তি অনুসারে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণাদির ভিত্তিতে তা খণ্ডনের চেষ্টা করা উচিত। আর তবলীগ বিভাগের আরেকটি কাজ হলো, পরিস্থিতি অনুসারে এমন সব আপত্তি এবং এর খণ্ডনমূলক প্রমাণাদি এক জায়গায়একত্রিত করে জামা'তসমূহে সরবরাহ করা যেন বিভিন্ন আপত্তির জ্ঞানগর্ভ ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণভিত্তিক খণ্ডন বেশির ভাগ মানুষের জন্য সহজলভ্য হয়।

হিকমত শব্দের অপর একটি অর্থ হলো, আদল বা ইনসাফ। বিতর্কের সময় এমন আপত্তি করা উচিত নয় যা উল্টো আমাদের বিরুদ্ধেই বর্তাতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়্যত ও সুশিক্ষা এবং বইপুস্তক আর খলীফাদের বইপুস্তকের কারণে সচরাচর এমনটি ঘটে না। কিন্তু অন্য সাধারণ মুসলমান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের মাঝে এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়। যেসব মুসলমান আমাদের বিরোধী তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও বর্তায়। অনেক বড় বড় মানুষ রয়েছে যারা নিজেদেরকে আলেম বলে মনে করে; তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমন আপত্তি করে বসে যা অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও বর্তাতে পারে। অতএব এদিক থেকেও তবলীগ বিভাগের উচিত এসব আপত্তি ও এর খণ্ডনগুলো একত্রিত করে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই এমনটি হয়ে আসছে, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমনসব আপত্তি করা হয় যা অন্যদের বিরুদ্ধেও যায় আর তাদের নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধেও । হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও তখন থেকেই তাদের এসব আপত্তির খন্ডন করে আসছেন আর তাদেরই বইপুস্তক থেকে তা দিয়েছেন। বিধর্মী ও মুসলমানদেরকে তাদেরই স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থ থেকে বলেছেন যে, তোমরা যে আপত্তি করছ এটি কোন আপত্তি নয়, কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন আপত্তি পূর্বেও করা হয়েছিল।

আমি যেমনটি বলেছি, তবলীগ বিভাগের এমন কিছু আপত্তিও ছোট প্যাম্ফলেটের আকারে ছাপিয়ে জামা'তগুলোতে সরবরাহ করা উচিত। বেশির ভাগ লোককে যদি তবলীগের কাজে নিয়োজিত করতে হয় তাহলে এ বিভাগেরএতটা পরিশ্রম করতেই হবে আর খরচও করতে হবে।

অনুরূপভাবে হিকমত শব্দের একটি অর্থ হলো, সহিষ্ণুতা ও কোমলতা। অতএব তবলীগের ক্ষেত্রেকোমলতা বা নমনীয়তা এবং বিবেকবুদ্ধি খাটানো একান্ত আবশ্যক। রাগ ও উগ্রতার সাথে কথা

অতএব আমাদের তবলীগি কর্মকাণ্ড হওয়া উচিত নিরবচ্ছিন্ন। বছরে একবার বা দু'বার তরবীয়তি ও তবলীগি আশারা উদ্‌যাপন করলাম এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে বইপুস্তক বিতরণ করলাম আর ধরে নিলাম যে, তবলীগের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে, এমনটি হওয়া উচিত নয়।

বললে অন্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে আর তারা মনে করে, কোন যুক্তিপ্রমাণ নেই তাই উগ্রতার সাথে উত্তর দেয়া হচ্ছে। যে রাগ দেখায় বা উগ্রতা প্রদর্শন করে তার সাথেও কোমল ভাষায় কথা বলা উচিত। ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করে তাদেরকে নামধারী আলেমদের উগ্রতা ও চরমপন্থাই আপত্তি করার রশদ জুগিয়েছে নতুবা শান্তভাবে কথা বলা হলে অনেক আপত্তি আছে যা এমনিতেই দূর হয়ে যায়।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো, নবুয়্যত। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্ক করা এবং যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের অর্থ হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুক্তিপ্রমাণ ও এর শিক্ষা অনুসারে আমাদের তবলীগ করা উচিত। আমি দেখেছি, ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী বা আপত্তিকারীদের সামনে যখন কুরআনী আয়াতের ভিত্তিতে কথা বলা হয় তখন তাদের ওপর খুব ভালো প্রভাব পড়ে।

হিকমত শব্দের আরেকটি অর্থ হলো, অজ্ঞতা থেকে মানুষকে দূরে রাখা। অতএব এমনভাবে কথা বলা উচিত যা অন্যদের জন্য সহজবোধ্য হয় এবং তার অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে। মহানবী (সা.)ও বলেছেন যে, মানুষের বোধ-বুদ্ধি অনুসারে তাদের সাথে কথা বল। (কানযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম মিন কিসমিল আকওয়াল, পৃ: ১০৫, হাদীস: ২৯৪৬৮)

এছাড়া এর আরেকটি অর্থ হলো, সত্য সম্মত ও যথার্থ কথা বলা। সর্বদা সত্য এবং বাস্তবতার নিরিখে কথা বলা উচিত। অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য সত্য এবং বাস্তাবতা-বিবর্জিত কথা বলা উচিত নয়। সত্যতা ও বাস্তবতা-পরিপন্থীকথা মন্দ প্রভাব ফেলে কেননা, কোন না কোন সময় সত্য প্রকাশ পেয়েই যায়। তাই সর্বদা সত্য ও বাস্তবধর্মী কথা বলা উচিত।

এছাড়া স্থান, কাল ও পাত্রের নিরিখে যথাযথ যুক্তিপূর্ণ কথা বলাকেও হিকমত বলা হয়। অর্থাৎ কোন যুক্তি-প্রমাণে যদি বিরোধীর রাগান্বিত বা উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং তবলীগি আলোচনার পরিবর্তেঝগড়াবিবাদ ও দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে এমন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এমন কথা বলা থেকে বিরত থেকে এরূপ কথা বলা ও প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত যা যথাযথওহবে একই সাথে অন্যের রুচিসম্মতও হবে এবং দূরত্ব বাড়ানোর পরিবর্তে কাছে টানার কারণ হবে। এক ব্যক্তি কোন বৈঠকে একটি কথা বলে আর অন্য কোন ব্যক্তি তা শুনে এবং তার ওপর এর সুপ্রভাব পড়ে। কিন্তু তখন এটি ভেবে চুপ হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যে, কখনো সুযোগ পেলে পুনরায় এই সভায় কথা বলা যাবে, সে ব্যক্তির পিছনে পড়ে যায় এবং বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বা তাকে মানানোর চেষ্টা করে যে, আজকে মানিয়েই ছাড়ব, তোমার মানতেই হবে, যার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে যায় এবং কাছে আসা ব্যক্তিও দূরে সরে যায় আর প্রথম কথার ইতিবাচক যে প্রভাব পড়েছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই স্থান, কাল, পাত্রভেদে কথা বলা তবলীগের জন্য একান্ত আবশ্যক। আর এটি এ দাবিও করে যে, তবলীগের কাজে যেখানে অবিচলতা ও দৃঢ়চিত্ততার পাশাপাশি ব্যক্তিগত যোগাযোগের গণ্ডি বিস্তৃত করাও আবশ্যক। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেই অন্যের রুচি সম্পর্কে জানা যায়।

অতএব আমাদের তবলীগি কর্মকাণ্ড হওয়া উচিত নিরবচ্ছিন্ন। বছরে একবার বা দু'বার তরবীয়তি ও তবলীগি আশারা উদ্‌যাপন করলাম এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে বইপুস্তক বিতরণ করলাম আর ধরে নিলাম যে, তবলীগের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে, এমনটি হওয়া উচিত নয়।

বর্তমানে এখানে অভিবাসন প্রত্যাশী বিভিন্ন বয়সের অনেক মানুষ রয়েছেন, অনেকে এমন আছেন যারা সুস্থসবল এবং যুবক শ্রেণির আর কতক আছেন কিছুটা বয়োবৃদ্ধ। তাদের মামলার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের অধিকাংশের হাতে সময় আছে । বেশির ভাগ সময় তাদের কোন কাজ থাকে না।অতএব এমন সব মানুষের উচিত তারা যেন নিজেদেরস্বাস্থ্য এবং বয়সের নিরিখে নিজেদেরকে তবলীগের কাজে পেশ করে। বইপুস্তক বিতরণের জন্য কম-বেশি যতটা সম্ভব সময় দেয়া উচিত। ভাষা না জানলে বইপুস্তক নিয়ে যান, ক্যাসেট ইত্যাদি নিয়ে যান। রাস্তায় যদি বইপুস্তক বিতরণ করতে হয় তাহলে এর জন্য একটি স্থায়ী পরিকল্পনা থাকা উচিত আর এসব অভিবাসন প্রত্যশীদেরকে এ কাজে লাগানো যেতে পারে। এটি পুণ্য বা সোয়াবেরও কারণ আর এতেতবলীগের দায়িত্বও পালন হবে। আর এর কল্যাণে হয়তো তাদের কেইসও দ্রুত পাস হয়ে যাবে। যাহোক, স্থায়ীভাবে তবলীগের জন্য তবলীগ বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের কাছে এসব দিক-নির্দেশনা যাওয়া উচিত এবং বই-পুস্তক সহজলভ্য হওয়া উচিত আর এরপর সেসব দিকনির্দেশন অনুসৃত হওয়া উচিত এবং এমনভাবে কথা বলা উচিত যা 'হিকমত' শব্দের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। ওহদাদারদেরও এতে যোগ দেয়া উচিত আর পুরোনো লোকদেরও অংশ নেয়া উচিত। আমি অভিবাসন প্রত্যাশীদের কথা বলেছি বিধায় কেবল তারাই এতে অংশ নিবে এমনটি হওয়া উচিত নয়। দা'ঈয়ানে খুসূসী বা বিশেষ দাঈইলাল্লাহ্‌দেরও কেবল নামেমাত্র দাঈইলাল্লাহ্ (প্রচারক) হলে চলবে না

বরং এখন বেশি সময় দিয়ে তবলীগের ময়দানে তাদের ঝাপিয়ে পড়তে হবে। পৃথিবীর অবস্থার নিরিখে আমাদের এখন জগদ্বাসীকে পরিস্কারভাবে বলতে হবে যে, তোমাদের বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত হওয়ার কারণে এবংখোদা তা'লার অসন্তুষ্টির কারণে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব একটি পথই খোলা আছে আর তাহলো, খোদার দিকে ফিরে আস এবং সত্য ধর্মের সন্ধান কর। 'মাওয়িযাতিল হাসানাতি'-র ভিত্তিতে তবলীগ করার যে নির্দেশ রয়েছে তা প্রজ্ঞার সাথে তবলীগ করার অর্থেও এসেছে। অর্থাৎ, কোমল ভাষায় এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারীভাষায় তবলীগ করা উচিত।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা প্রজ্ঞা, সুন্দর নসীহত এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে তবলীগের যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুসারে কাজ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। আর অবিচলতার সাথে তা অব্যাহত রাখা আমাদের দায়িত্ব।এর ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, আমি নিজেই প্রকাশ করব যে, কে ভ্রষ্টতায় হাবুডুবু খাবে আর কে সঠিক পথ পাবে। এ বিষয়গুলো আল্লাহ তা'লাই ভালো জানেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'লা বলেছেন, তুমি বাহুবলে কাউকে হিদায়াত দিতে পারবে না। অবশ্য তোমাদের দায়িত্ব হলো তবলীগ করা, সত্যের বাণী প্রচার করা, সত্যের বাণী পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো। ইসলামের সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় শিক্ষা অন্যদের সামনে প্রকাশ ও প্রচার করা।তোমরা তা অব্যাহত রাখ। মানুষ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না যে, সে বলবে– সময় নষ্ট করার পরিবর্তে যার ওপর প্রভাব পড়বে তার কাছে গিয়েই আমি পয়গাম পৌঁছাব। মানুষ তো জানে না যে, কার ওপর প্রভাব পড়বে। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাকে এই জ্ঞান দেয়াই হয় নি যে, কার ওপর প্রভাব পড়বে আর কার ওপর পড়বে না। তাই খোদা তা'লার এই নির্দেশ বা উক্তি অনুসারে ফলাফলের জন্য আমরা দায়ী নই যে, কেন তবলীগের ইতিবাচক ফলাফল প্রকাশ পেল না বা কেন শতভাগ মানুষ আমাদের পয়গামে বা তবলীগে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কেবল এতটুকুই জিজ্ঞেস করবেন যে, আমরা বার্তা পৌঁছে দিয়েছি কিনা? অথবা কেন আমরা তবলীগের দায়িত্ব পালন করি নি এবং কেন খোদার নির্দেশ অনুসারে তবলীগ করি নি? কে হিদায়াত পাবে আর কে পাবে না তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। আমরা যদি স্বীয় দায়িত্ব পালন করে থাকি তাহলে অন্ততপক্ষে এ পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুর পর এ কথা বলতে পারবে না যে, আমরা তো ইসলামের সংবাদই পাই নি, আর আমরা যেহেতু ইসলামের সংবাদ পাই নি তাই আমাদের কোন দোষ নেই।

অনেকেই পয়গাম শুনে এবং বুঝেও, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন কিছু তাদের পথে বাধ সাধে, তারা সত্য গ্রহণ করে না। এই দু'দিন পূর্বেই ইউরোপের এক দেশের মুবাল্লিগ আমাকে লিখেছেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি যারা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, আর জার্মানিতে জলসায়ও যোগদান করেছিল,তবলীগ এবং জলসার পুরো পরিবেশের খুবই ইতিবাচক প্রভাবও পড়েছে। বেশ কয়েকবার বয়আত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও তার (অর্থাৎ এক ব্যক্তির) পথে কোন কিছু বাধ সাধে। এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, তারা সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য পাবে কি পাবে না, কিন্তু আমরা অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি, আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছি।

তবলীগ সম্পর্কে কেউ কেউ আরো একটি কথা জিজ্ঞেস করে বা প্রশ্ন করে যে, তবলীগ করে তুমি কয়জনকে আহমদী বানিয়েছ? এছাড়া এটিও বলে যে, স্বয়ং মুসলমানরাই তোমাদেরকে মুসলমান মনে করে না। আবার এটিও জিজ্ঞেস করে যে, যেভাবে তোমরাতবলীগ কর আর ইসলামের বাণী প্রচার কর সেভাবে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে কত সময় লাগবে? আর একই সাথে এটাও স্বীকার করে যে, বাহ্যত তোমাদের কথাই যুক্তি ও প্রজ্ঞাসম্মত। আমাকেও অনেকেই প্রশ্ন করেছে এবংবিভিন্ন জায়গায় জিজ্ঞেস করে। সাম্প্রতিক জার্মানসফরেও এক সাংবাদিক এই প্রশ্ন করেছে। অতএব আমাদের উত্তর সবসময় এটিই যে, আমাদের জন্য নির্দেশ হলো তবলীগ করা এবং বার্তা পৌঁছানো, আমরা তা থেকে পিছিয়ে যেতে পারি না এবং যাবও না। আমরা আমাদের কাজ করে যাব। কে হিদায়াত পাবে আর কে পাবে না এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। আমাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব রয়েছে তা আমরা পালন করে যাব। কিন্তু একই সাথে খোদার এই প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন, ইনশাআল্লাহ্। তাই আমরা এই আশায় বুক বাঁধি যে, ইনশাআল্লাহ্ একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি আমাদের হবে।

আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এর ব্যাখ্যায় কোন কোন স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উক্তি রয়েছে। অতএব নিজের সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে যে, কীভাবে অনেক সময় ইসলাম বিরোধীরা তাঁকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এই আয়াতের শিক্ষা শিরোধার্য করে শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় এবং ঝগড়াবিবাদ যাতে ছড়াতে না পারে সে মর্মে তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন, এ সম্পর্কে স্বীয়পুস্তকে তিনি লিখেন:

"আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমরা কখনো উত্তর দিতে গিয়ে কোমলতা এবং নমীয়তাকে বিসর্জন দেই নি।"(অর্থাৎ এটি কখনো হয় নি যে, আমরা কোমলতা আর নম্র ভাষণকে পরিত্যাগ করেছি)"সবসময় কোমল এবং নরম ভাষায় কথা বলেছি। অবশ্য অনেক সময় বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর ও নৈরাজ্যকর রচনা দেখে কিছুটা কঠোরতাকে সংগত মনে করেসংশোধনের উদ্দেশ্যে আমরা এজন্য অবলম্বন করেছি, (অর্থাৎ অনেক সময় কঠোর হয়েছি কেননা, বিরুদ্ধবাদীদুষ্টআলেমরা এবং দুষ্কৃতিতে সীমালঙ্ঘনকারী নেতারা সাধারণ মানুষকেও উত্তেজিত করে ও খেপিয়ে তুলে। তাই এই কঠোরতা তাদেরকে উত্তর দেয়ার জন্য এবং তারা রচনায় যা লিখেছে এটি তারই অনুরূপ আর সেরূপ লেখাই আমরা লিখেছি।) "যাতে করে মানুষ এভাবে সমুচিত উত্তর পেয়ে দুর্বার উত্তেজনাকে দমন করে।"

পৃথিবীর অবস্থার নিরিখে আমাদের এখন জগদ্বাসীকে পরিস্কারভাবে বলতে হবে যে, তোমাদের বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত হওয়ার কারণে এবংখোদা তা'লার অসন্তুষ্টির কারণে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব একটি পথই খোলা আছে আর তাহলো, খোদার দিকে ফিরে আস এবং সত্য ধর্মের সন্ধান কর। 'মাওয়িযাতিল হাসানাতি'-র ভিত্তিতে তবলীগ করার যে নির্দেশ রয়েছে তা প্রজ্ঞার সাথে তবলীগ করার অর্থেও এসেছে। অর্থাৎ, কোমল ভাষায় এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারীভাষায় তবলীগ করা উচিত।

(আর এটিও এজন্য যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে হলে তিনি সে উত্তর ততটা কঠোরতার সাথেই দিয়েছেন যতটা দেয়া যায়। এর বেশি উত্তেজনা দেখানোর প্রয়োজন নেই আর এর বেশি ক্রোধান্বিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই যার ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধতে পারে।) তিনি (আ.) বলেন,"আর এ কঠোরতা রিপুর তাড়নায়ও নয় এবং উত্তেজনার বশবর্তী হয়েও নয়, বরং আয়াত 'ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান' (সূরা আন্-নমল: ১২৬)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে।" অনেক সময় কঠোর হতে হয়, তো সেই কঠোরতাও এই আয়াতের শিক্ষা অনুসারেই হয়ে থাকে। আরপ্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপন্থা হিসেবে এটিকে অবলম্বন করা হয়েছে, অর্থাৎ এমনভাবে কথা বল যা সঠিক এবং স্থান, কাল ওপাত্রভেদে হয়। আর সেই মুহূর্তে বিরোধীকে অনুরূপ উত্তর দেয়াই আবশ্যক হয়ে পড়ে, এ কারণেই অনেক সময় কঠোরতাও প্রকাশ পায়; কিন্তু সার্বিক নীতি হওয়া উচিত কোমলতা প্রদর্শন। তিনি বলেন,এই আয়াতের ওপর আমল করে এটিকে প্রজ্ঞাপূর্ণকর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করা হয়েছে "কিন্তু এটিও সেই সময় যখন বিরোধীদের অবমাননা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং অপমানজনক কথাবার্তা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে আর আমাদের নেতা ও মনিব এবং সমগ্র বিশ্বের গর্ব রসূল (সা.) সম্পর্কে এমন নোংরা ও দুষ্কৃতিমূলক শব্দ তারা ব্যবহার করেছে যে, এর ফলে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অতএব এমন সময় আমরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছি। (আলবালাগ, রূহানী খাযায়েন, ১৩শ খণ্ড, পৃ: ৩৮৫)

অতএব যেখানে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় সেখানে 'জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান'-এর অর্থ হলোদ্বিতীয় ব্যক্তি যে কর্মপন্থা অবলম্বন করে সেই একই কর্মপন্থা অবলম্বন করে কিছুটা কঠোরতার সাথে উত্তর দেয়া।অতএব মূল উদ্দেশ্য হলো অশান্তি এবং নৈরাজ্যের পথ বন্ধ করা আর সঠিকভাবে বাণী পৌঁছানো। এগুলো আবশ্যকীয় বিষয়। তিনি কখনো সেই পন্থা অবলম্বন করেন নি যা বিরোধীরা করেছে। এর পরিবর্তে তিনি এটিও বলেছেন যে, সরকারের কথা মানা এবং আইন মেনে চলা আবশ্যক। আর অশান্তি যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্য তিনি যুক্তির ভিত্তিতেইকথা বলেছেন এবং আইনের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু যেখানে আত্মাভিমান প্রদর্শন করা আবশ্যক সেখানে তিনি আত্মাভিমানও দেখিয়েছেন।

আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলে, ' জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান' আয়াতের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আমরা অধিক নমনীয় হয়ে কপটতা করে বাস্তবতা-পরিপন্থি কথাকে গ্রহণ করে নেবো। যে ব্যক্তি খোদা হওয়ার দাবি করে এবং আমাদের রসূল (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে তিনি মিথ্যাবাদী হবেন (নাঊযুবিল্লাহ্) আর হযরতমূসার নাম ডাকাত রাখে, এমন মানুষকে কি আমরা সত্যবাদী বলতে পারি? এমন করাকে কি 'মুজাদেলায়ে হাসানা' বলা যেতে পারে? মোটেই নয়। বরং এটি কপটাচার আর ঈমানহীনতার লক্ষণ।" (তিরইয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, ১৫তম খণ্ড, পৃ: ৩০৫, টীকা)

অতএব এ বিষয়গুলোর পার্থক্যও আমাদেরকে সবসময় এজন্য সামনে রাখতে হবে যে,তবলীগ করতে হবে বলে কপটতা যেন প্রকাশ না পায়। আর অন্যদের কথা শোনাতে হবে বলে আমরা যেন এতদূর না চলে যাই যে, আত্মাভিমানই পুরোপুরি হারিয়ে যাবে! হ্যাঁ, ঝগড়াবিবাদ করা উচিত নয়। কিন্তু একটি সীমার ভেতর থেকে কখনো কখনো তাদের কথাই তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হয়। অতএব আপত্তির ক্ষেত্রে বিরোধী যেখানে সীমা ছাড়িয়ে যায় বা তাদের কথায় যদি সীমাতিরিক্ত ঔদ্ধত্য থাকে এবংনোংরা শব্দ থাকে তাহলে অনেক সময় সেখানে নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা প্রতিহত করার জন্য উত্তর দিতে হয়। অনুরূপভাবে তিনি (আ.) এটিও বলেছেন যে, নম্রতার বা কোমলতার অর্থ আদৌ এটি নয় যেকপটতা প্রদর্শন করবে আর এতটা ভয় পাবে যে, তাদের কথায় সায় দেবে আর বাস্তবতা পরিপন্থি কথা মেনে নেবে; যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি। প্রজ্ঞা প্রদর্শন করা আবশ্যক। ভাষার কোমলতা এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করাও আবশ্যক কিন্তু ভ্রান্ত কথাকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করাও আবশ্যক।

অতএব এ কথাটিও সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রজ্ঞার অর্থ ভীরুতা নয় বা নিজের কাছে টানার জন্য ভ্রান্ত কথার সত্যায়ন করাকে প্রজ্ঞা বলা হয় না। উদাহরণস্বরূপ আজকাল জগত পূজারীরা স্বাধীনতার নামে এমন আইন প্রণয়ন করেছে যার অনুমতি শরীয়ত আদৌ দেয় না। আর তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললে তারা বলে যে,আহমদীরাও প্রগতিশীল

> অতএব প্রথমে উত্তম আদর্শ হও এরপর ইসলামের তবলীগ কর, এর শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর। সুতরাং তবলীগ করার জন্য প্রথমে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে মানুষের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ না হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই কোন কিছুর প্রতি মনোযোগী হয়। আর এভাবে রীতিমত তবলীগ করার পূর্বেই তবলীগের পথ সুগম হয়ে যায়।

হওয়ার দাবী করে আর উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে কথা বলে , দেখায় যে, আমরা কট্টরপন্থী নই। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে এরাও কট্টরপন্থী। আর এর উদাহরণ দিতে গিয়ে মহিলাদের সাথে করমর্দনের বিষয়টি নিয়ে আসে বা সমকামিতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। সম্প্রতি জার্মান সফরে কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছে আর আমার উত্তরে তাদের কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্যও করেছে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, বাস্তবতা কী। আমাদের ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু যা ভুল বা যা ভ্রান্ত সেটিকে আমাদের অবশ্যই ভ্রান্ত আখ্যায়িত করতে হবে।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের এক রাজনৈতিক দলের সদস্য, যার সম্পর্কে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি পার্টির নের্তৃত্বের দৌড়ে অংশ নিবেন, তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি দলনেতা হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন না কেননা, প্রথমত তিনি সমকামিতার বিরোধী এছাড়া তিনি গর্ভপাতের বিরোধী। তিনি বলেন, আর এই উভয় বিষয় এমন যার বিরুদ্ধে কথা শুনার মনমানসিকতা আমাদের সমাজে নেই। সমকামিতার যতটুকু প্রশ্ন আছে, কুরআন ও বাইবেল উভয় কিতাবে জাতিগত পর্যায়ে এমন পাপে লিপ্তদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তুকোন কোন ক্ষেত্রে গর্ভপাতকেআমরা বৈধ মনে করি। যাহোক, এটি তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, তিনি বুঝেন না।

অনুরূপভাবে আরেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা কয়েক মাস পূর্বে নিজ দলের নেতৃত্ব থেকে এজন্য পদত্যাগ করেছেন যে, তিনি সমকামিতার বিরোধী ছিলেন।তিনি বলেন, একই কারণে আমি আমার বিশ্বাস এবং রাজনীতির মাঝে বিরোধ দেখছিলাম। তাই আমার জন্য উত্তম হবে নিজের ঈমান বা বিশ্বাসকে রক্ষার জন্য পার্টির নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়া।

অতএব এরা যারা বস্তুবাদী এবং যাদের ধর্মও সঠিকরূপে বিদ্যমান নেই, তারা যদি নিজেদের জাগতিক বিষয়াদিকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করে আর কপটতা প্রদর্শন ও ভীরুতা প্রদর্শন না করে তাহলে আমরা যারা শেষ এবং চিরস্থায়ী শরীয়তের মান্যকারী,আমাদের ঈমান কতটা দৃঢ় হওয়া উচিত আর (কতটা দৃঢ়তার সাথে) জাগতিক সম্পর্কের গণ্ডিতে এবংতবলীগের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার সাথে ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে এসব কথার খণ্ডন করা উচিত। জাগতিক স্বার্থে এসব বিষয়কে ভয় পাওয়াও উচিত নয় আর তাদের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের কথায় সায় দেয়ারও প্রয়োজন নেই। প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা হলে কোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। এছাড়াপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে আর আল্লাহ্‌ তা'লাও বলেছেন যে, কে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য তা আমি ভালো জানি। অতএব খোদা যাকে হেদায়াত দিতে চান তার হৃদয় আল্লাহ্‌ তা'লা স্বয়ং উন্মুক্ত করেদিবেন। পদধারীদের বিশেষভাবে এ দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। আমি দেখেছি তাদের পক্ষ থেকেও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি ভীরুতা প্রদর্শিত হয়। বিরোধীতার কোন পরোয়া করা উচিত নয়। বিরোধীতা তবলীগেরই পথ উন্মোচন করে।

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন: "মিথ্যা যত প্রবলভাবে সত্যের বিরোধিতা করে সত্যের শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের মাঝে এ কথা প্রশিদ্ধ রয়েছে যে, জৈষ্ঠ্য মাসে তাপমাত্রা যত বাড়ে শ্রাবণ মাসে ততবেশি বৃষ্টি হয়।"(অর্থাৎ মে জুন মাসে গরম বা তাপমাত্রা যতটা বৃদ্ধি পায় বর্ষাকালে অর্থাৎ জুলাই আগষ্ট সেপ্টম্বরে যখন মৌসুমি বায়ু আসে সে সময় বৃষ্টিও অনেক বেশি হয়।) তিনি বলেন, "এটি একটি প্রাকৃতিক বিষয়। সত্যের বিরোধিতা যত প্রবল হয় ততই তার উজ্জ্বল্য প্রকাশ পায় এবং স্বীয় প্রভাব-প্রতাপ বিস্তার করে। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, যেখানে যেখানে আমাদের সম্পর্কে বেশি হৈচৈ হয়েছে সেখানেই এক জামা'ত প্রস্তুত হয়েগেছে। আর যেখানে মানুষ কথা শুনে নীরব হয়ে যায় সেখানে খুব বেশি উন্নতি হয় না।" (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১০-৩১১, এডিশন: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

এ দৃশ্য আমরা আজও দেখতে পাই। সম্প্রতি জার্মানিতে আলজেরিয়া থেকে আগত সেখানকার এক প্রশিদ্ধ অ-আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এটি সত্য কথা যে, আলজেরিয়ায় এখন আপনাদের জামা'ত খুব কষ্টের সময় অতিবাহিত করছে। কিন্তু এই বিরোধিতার কারণে জামা'তের পরিচিতি এবং তবলীগ দেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, আর মানুষ এখন জামা'ত সম্পর্কেজানে। তিনি বলেন, এই বিরোধিতার কারণে জামা'তের যে পরিচিতি লাভ হয়েছে সেটি হয়ত দশ-বিশ বছরেও আপনাদের দ্বারালাভ করা সম্ভব হতো না। এছাড়া সেখানকার আহমদীরাও এ কথা লিখেছে যে, পরিস্থিতি কিছুটা

অনুকূল হলেও অনেক অঞ্চল এমন রয়েছে যেখানে মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অতএব বিরোধিতা বা জগতবাসীদের কোনভাবে ভয় করা উচিত নয়। কিন্তু একই সাথে হিকমত বা প্রজ্ঞাও আবশ্যক। তবলীগের জন্য আরেকটি আবশ্যিক কথা হলো, মানুষের কথা এবং কর্মে সামঞ্জস্য থাকা। অর্থাৎ, যা বলে তা যেন মেনেও চলে। প্রজ্ঞার কথাও মুখ থেকে তখনই বের হয় এবং অন্যদের ওপর তখনই প্রভাব বিস্তার করে যখন কথা এবং কর্মে সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে একবার বলেন,

"অনেকেই মৌলবি এবং আলেম আখ্যায়ীত হয়ে মিম্বরে উঠে রসূলের নায়েব এবং নবীর উত্তরাধিকারী আখ্যায়ীত হয়ে বক্তৃতা করে বেড়ায় আর বলে যে, অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও পাপাচার এড়িয়ে চল। কিন্তু তাদের কর্মের স্বরূপ দেখএবং যা তারা নিজেরা করে তার ধারণা এটি থেকে করে নাও যে, তোমাদের হৃদয়ে এসব কথার কতটা প্রভাব পড়ে।"(তবলীগকারীর কথার প্রভাবওতখনই পড়বে যখন তার কথা এবং কর্ম এক হবে।) তিনি বলেন,"এমন মানুষ যদি ব্যবহারিক শক্তি বা কর্মশক্তিও রাখতো, আর মানুষকে বলার পূর্বে যদি নিজেরা আমল করতো তাহলে পবিত্র কুরআনে "লিমা তাকুলুনা মা লা তাফয়ালুন" (সূরা সফ: ০৩) বলার কী প্রয়োজন ছিল? এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই পৃথিবীতে কথা বলে নিজে আমল না করার লোকছিল এবং আছে আর থাকবে। তোমরা আমার কথা ভালোভাবে শুন এবং ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, মানুষের কথাযদি আন্তরিক না হয় আর তাতে যদি কর্মশক্তি না থাকে তাহলে তা প্রভাব বিস্তার করে না। আমাদের মহানবী (সা.)-এর সত্যতা এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। কেননা, যে সাফল্য এবং হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের যে সৌভাগ্য তাঁর লাভ হয়েছে তার দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর এসব কিছু এজন্য হয়েছে যে, তাঁর কথা এবং কাজে পুরো সামঞ্জস্য ছিল।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৭-৬৮, এডিশন: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো!" (এখানে আমাদেরকেও নসীহত করছেন যে,) "শুধু বড় বড় শব্দ ব্যবহার করা আর বুলি আওড়ানো কোন কাজে আসতে পারে না, যতক্ষণ আমল বা ব্যবহারিক শক্তি না হবে। কেবল কথা খোদার দরবারে কোন গুরুত্বই রাখে না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "কাবুরা মাকতান ইনদাল্লাহি আন তাকুলু মা লা তাফয়ালুন" (সূরা সফ: ০৪)। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৭, এডিশন: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, মু'মিনের দ্বিমুখী হওয়া উচিত নয় (বা কপটতা থাকা উচিত নয়)। ভীরুতা এবং কপটতা তার থেকে সবসময় দূরে থাকে। নিজের কথা এবং কর্মকে সর্বদা সঠিক রাখ এবং এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি কর, যেভাবে সাহাবীরা নিজেদের জীবনে করে দেখিয়েছেন। তোমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪, এডিশন: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

আরেক জায়গায় নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,"ইসলামের সুরক্ষা এবং এর সত্যতা প্রকাশ করার জন্য সর্বপ্রথম দিক হলো, তোমরা প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখাও। আর দ্বিতীয় দিক হলো, এর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর। (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩২৩, এডিশন: ১৯৮৫, ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত)

অতএব প্রথমে উত্তম আদর্শ হও এরপর ইসলামের তবলীগ কর, এর শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে প্রচার কর। সুতরাং তবলীগ করার জন্য প্রথমে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন। মানুষ যদি প্রকৃত অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে মানুষের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ না হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মানুষ দৃষ্টান্ত দেখেই কোন কিছুর প্রতি মনোযোগী হয়। আর এভাবে রীতিমত তবলীগ করার পূর্বেই তবলীগের পথ সুগম হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই অনুসারে চলার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

[৩ পৃষ্ঠার ধারাবাহিকতায় টিকার অবশিষ্টাংশ]

এ আকস্মিক দুর্ঘটনা যখন ঘটেছিল তখনো হযরত ঈসা (আ.) কাশ্মীরে বসবাস করছিলেন। এরও উল্লেখ আছে হযরত মূসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে (দ্বিতীয়-৩২:১৮-২৬)। বাইবেলে যেখানে প্রথম শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় আযাব সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী এর পরেই লিপিবদ্ধ রয়েছে (দ্বিতীয়-২৮ অধ্যায়)। ভবিষ্যদ্বাণীর পরে এরও উল্লেখ রয়েছে যে, ইহুদী জাতি জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তন করবে (দ্বিতীয়-৩০:১৫)। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, এ ভবিষ্যদ্বাণী (দ্বিতীয়-৩২:১৮-২৬) দ্বিতীয় আযাবের প্রতি নির্দেশ করছে, যার প্রতি কুরআন মজীদে ইঙ্গিত রয়েছে, যথা: অবশ্যই তোমরা পৃথিবিতে দু'বার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে (১৭:৫)। এ আয়াতে মুসলমানদের জন্য এই সতর্কতার সঙ্কেত নিহিত রয়েছে যে, তারা যদি অসৎ পথ পরিত্যাগ না করে তবে ইহুদীদের মত তারাও দু'বার শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু সময়ের সঙ্কেত হতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে নি এবং অসদাচরণ থেকে বিরত না হওয়ার দরুন তারা প্রথম আযাবে পতিত হয়েছিল ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন বাগদাদের পতন ঘটেছিল। হালাকু খাঁর বর্বর তাতার যাযাবর দল মুসলমানদের ক্ষমতা ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং ১৮ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছিল। যা হোক এ ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে ইসলাম বিজয়ীরূপে প্রকাশ লাভ করেছিল তখন যখন বিজয়ীগণ কালক্রমে পরাজিত হলো। হালাকুর পৌত্র (গজন খান) মোগল ও তাতার বাহিনীর এক বিরাট দলসহ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় আযাব আখেরী যামানাতে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত।

জুমুআর খুতবা

একজন প্রকৃত আহমদীর বৈশিষ্ট

“দৈনন্দিন কার্যক্রমে অবৈধ বা অন্যায় ক্রোধ এবং রাগ থেকে মুক্ত হওয়া এটিও তাক্বওয়ার একটি শাখা।”

নেদারল্যান্ডের নুনস্পিটস্থ মসজিদ বাইতুন নূর-এ প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৯ই অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখানে আহমদীদের বেশিরভাগ জন্মগত আহমদী অথবা তারা, যাদের পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে একেবারে তাদের শৈশবে এবং তারা আহমদী পরিবেশেই লালিত পালিত হয়েছেন। তাদের অধিকাংশই পাকিস্তানি যাদেরকে এই দেশে থাকার এবং এখানকার নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে এজন্য যে, তারা এখানে এসে ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানে আমাদের স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষানুসারে, ইসলামী শিক্ষামালা অনুসারে মত প্রকাশ বা ধর্মানুশীলনের অনুমতি নেই। কিছু মানুষ এমনও হবেন যাদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে।

অতএব বেশির ভাগ আহমদীকে এখানে থাকার অনুমতি প্রদান বা আপনাদের প্রতি এখানকার সরকারের স্নেহদৃষ্টির কারণ হলো, আপনারা নিজেদের আহমদী বলে পরিচয় দেন। অতএব আহমদী হওয়ার এই ঘোষণা আপনাদের ওপর কিছু দায়িত্বও অর্পণ করে আর এই দায়িত্ব থেকে সেসব আহমদীও মুক্ত নয় যারা নিজেদের শিক্ষাগত বা অন্য কোন

দক্ষতার কারণে এই দেশে এসেছেন এবং এখানে এসে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নৈপুণ্যে আরো ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টির সুযোগ পেয়েছেন। সেই সাথে তারা নিজেদের আহমদীয়া জামা'তের সদস্য বলেও দাবী করেন। অনুরূপভাবে নবাগত আহমদীরাও রয়েছে। তারা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন কেননা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির ওপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। আর বয়আতের পর তাদের ওপরও বয়আতের এই অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। খোদা তা'লা তাদেরকে একথা বললেই দায়মুক্ত করবেন না যে, আমরা জন্মগত আহমদীদের অথবা পুরোনো আহমদীদের যা বা যেমনটি করতে দেখেছি তাই আমরা করেছি।

এ যুগে আমাদের তরবীয়তের জন্য কুরআন ও সুন্নত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তফসীর, ব্যাখ্যা ও রচনাবলী বুঝা, দেখা এবং পড়া আবশ্যক। এগুলো আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। অতএব কারো কোন অজুহাত ধোপে টিকবে না। কিন্তু এখানে পুরোনো আহমদীদের আমি এই কথাও বলব, আপনাদের আচার-ব্যবহার দেখে কেউ যদি হোঁচট খায় তাহলে তাদের এই ভুল এবং পাপের দায় আপনাদের ওপরও বর্তাবে। অতএব পুরোনো আহমদী যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা এই অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন যে, তাদের পিতৃপুরুষ বা পূর্বপুরুষ আহমদী হয়েছিলেন অথবা যারা শিশুকালেই আহমদীয়াত গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা এখানে এসে উত্তম সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছেন বা ভাল সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন তাদেরও এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তারা জামা'তের অনুগ্রহ তলে রয়েছেন।

জামা'তের এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের নিজেদের অবস্থায় অসাধারণ পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত এবং নিজের সন্তান-সন্ততিদেরও আল্লাহ্ তা'লার জামা'তভুক্ত হওয়ার কারণে এই ইহসান বা অনুগ্রহ সম্পর্কে বলতে থাকা উচিত বা অবহিত করতে থাকা উচিত এবং সেই সাথে এটিও স্মরণ করাতে থাকা উচিত যে, তাদের দায়িত্ব কী আর আপনাদের পূর্বপুরুষরা জামা'তভুক্ত হয়ে বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছিলেন সেই অঙ্গীকারকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের কীভাবে তা পালনের চেষ্টা করে যেতে হবে।

> "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সমস্ত আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটিল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবক সুলভ অবস্থার মাঝে এর কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।"

এখানে আসার ফলে আর্থিক যে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হয়েছে সেই কারণে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে আমাদের নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও এই শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং আমাদের সন্তানদেরকে এটি বলতে হবে, তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে আরো প্রস্ফুটিত করার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এর জন্য তোমরা খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখবে। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হলো, যখন সে নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দিবে বা আহমদী বলে দাবি করবে তখন জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সর্বদা সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখা। এটি তোমার জন্য আবশ্যক কেননা, একথাই বয়আত করার সময় তুমি অঙ্গীকার করেছিলে। এটি আল্লাহ্ তা'লার ফযল বা অপার অনুগ্রহ, নবাগত আহমদীরা বিশেষ করে যারা পুরো বিশ্বাসের সাথে এবং সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবিকে সত্য বলে মেনেছেন, তারা নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার এবং শর্তাবলীর ওপর অভিনিবেশও করেন।

অনেক মানুষ চিঠি-পত্রও লিখে থাকেন কিন্তু অনেকেই এমনও আছেন যারা জন্মগত আহমদী অথবা যাদের শিশুকালেই তাদের পিতামাতা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং যারা পার্থিবতা উপার্জনের পিছনে লাগামহীনভাবে ছুটছে, এখানে এসে সাধারণত তারা বয়আতের শর্তাবলীর ওপর অভিনিবেশ করে না বা প্রণিধান করে না আর বয়আতের অঙ্গীকারও তারা বুঝে না এবং আহমদীয়াতের কারণে আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহ– সেটিও তারা স্মরণে রাখে না। এখন তো এমটিএ'র মাধ্যমে সর্বত্র বয়আতের অনুষ্ঠান দেখা যায় ও শোনা যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বয়আতের মর্ম অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা তারা করে না। অনুরূপভাবে আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সেভাবে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টাও তারা করে না যেভাবে সম্পর্ক গড়ার দায়িত্ব রয়েছে। আর এক্ষেত্রে শুধুমাত্র যারা এসাইলাম নিয়ে বা শরণার্থী হয়ে এদেশে এসেছেন তারাই নয় বরং সব শ্রেণীর মানুষ অন্তর্ভুক্ত। আমি এসাইলাম প্রার্থী বা শরণার্থীদের দৃষ্টান্ত এজন্য দিয়েছি কেননা, এখন আমার সামনে অধিকাংশই এসাইলাম প্রার্থী বা শরণার্থী রয়েছেন। আজ তাদের যে উত্তম অবস্থা তা শুধুমাত্র

জামা'তের সদস্য হওয়ার কল্যাণেই হয়েছে নতুবা এমন মানুষ সব জায়গায় এবং সব শ্রেণীতেই দেখতে পাওয়া যায়।

অতএব প্রত্যেকে যখন আত্মজিজ্ঞাসা করবে বা আত্মবিশ্লেষণ করবে তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে, সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বা তার অবস্থান কি? এই আত্মবিশ্লেষণের জন্য এখন আমি বয়আতের শুধুমাত্র একটি শর্ত আপনাদের সামনে পাঠ করছি। এটিকে শুধুমাত্র ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখবেন না বরং এর প্রতি অভিনিবেশ করুন এবং এরপর আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুন। যদি এই আত্মবিশ্লেষণের উত্তর ইতিবাচক হয় তাহলে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান এবং সে আল্লাহ্ তা'লার ফযল বা কৃপা লাভ করবে। আর যদি দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে সংশোধনের চেষ্টা করুন। বয়আতের দশম শর্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, শর্তের বাক্যাবলী হচ্ছে, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সমস্ত আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবক সুলভ অবস্থার মাঝে এর কোন তুলনা পাওয়া যাবে না।"

অতএব এহলো সেই বাক্য যা আমাদের ওপর তিনি (আ.)-এর প্রতি নিঃস্বার্থ এবং অসাধারণ ভালোবাসা এবং সম্পর্ক গড়ার দায়িত্ব অর্পণ করে। তিনি (আ.) আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিচ্ছেন, কী অঙ্গীকার নিচ্ছেন? এই অঙ্গীকার নিচ্ছেন, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আমার সাথে উন্নত মানের ভালোবাসার সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলো। এই অঙ্গীকার নিচ্ছেন, তোমরা এই অঙ্গীকার কর যে, আপনার প্রত্যেক মা'রূফ ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত মেনে নেব। অর্থাৎ প্রত্যেক সেই কাজ যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেক সেই কথা যার পানে ইসলামের শিক্ষামালার আলোকে তিনি আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন। এরপর শুধুমাত্র মান্য করাই যথেষ্ট নয়, এর প্রতি কেবল পূর্ণ আনুগত্যই নয় বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এর ওপর অটল থাকার চেষ্টা করব এবং আমল করব ও অনুশীলন করব। আর এই অঙ্গীকারও রয়েছে, এই ভালোবাসা এবং সম্পর্ক বন্ধন যা গড়ে উঠবে এর মান এত উন্নত হবে, এই বন্ধন এত গভীর হবে যে, পার্থিব কোন আত্মীয়তার মাঝে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

এই উপমা বা দৃষ্টান্ত সেই অবস্থায়ও দেখতে পাওয়া যাবে না যখন মানুষ কারো প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে তার সাথে বিশুদ্ধ বা আন্তরিক সম্পর্ক রাখে। এর দৃষ্টান্ত এমন অবস্থায়ও পাওয়া যাবে না যখন মানুষ কারো অনুগ্রহতলে এসে নিজেকে তার হাতে তুলে দেয়। অতএব এই যে অঙ্গীকার অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর পর উন্নত মানের ভালোবাসা যদি কারো প্রতি হতে পারে তাহলে তা তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের সাথেই হতে পারে, এটিই হচ্ছে সেই মান যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর তাঁর সাথে কিরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, এসব কথার আলোকে প্রত্যেকেই সেক্ষেত্রে নিজের বিশ্লেষণ করতে পারে, আমাদের মাঝে এই মান প্রতিষ্ঠিত আছে কী? নাকি যখন কোন পার্থিব বিষয়াদি আমাদের সামনে আসে, পার্থিব স্বার্থ আমাদের সামনে আসে অথবা পার্থিব লাভ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমরা এগুলো ভুলে যাই এবং পার্থিব সম্পর্ক ও পার্থিব উদ্দেশ্যাবলী ভালোবাসার এই সম্পর্ক এবং আনুগত্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। মানুষ কোন কাজ হয় নিজের লাভ এবং নিজের স্বার্থের জন্য করে থাকে অথবা যদি তা মনোমত না হয় তাহলে অনেক সময় বা অধিকাংশ সময় মানুষ ভয় পেয়েও করে থাকে বা করতে বাধ্য হয় কেননা, যদি তা না করে তাহলে জিজ্ঞাসা করা হবে আর হতে পারে এর ফলে শাস্তিও পাবে। অথবা ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সে তা করে। কারো যদি ধর্মের সঠিক জ্ঞান এবং বুৎপত্তি থাকে তাহলে মানুষ ভালোবাসা, আন্তরিকতা,

"তোমরা দু'টি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখো। প্রথম কথা হলো, তোমরা সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে দেখাও আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, ইসলামের সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও।"

নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েই ধর্মীয় কাজ করবে।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা রেখেছেন, তাঁর হাতে বয়আত করার পর আমরা এই চেতনায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হব। যতক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্য এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এই চেতনা এবং সম্পর্ক নিজেদের মাঝে সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেসব উপদেশ দেয়া হয় এর কোন প্রভাব পড়বে না আর এর ওপর আমল করারও কোন চেষ্টা থাকবে না। অতএব যদি উপদেশের ওপর আমল করতে হয়, তাঁর (আ.) কথা মানতে হয়, নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হয় তাহলে নিজেদের ইতায়াত, আনুগত্য, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার মানকে সমুন্নত করতে হবে। কোন আহমদী কখনো এটি ভাবতে পারে কি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআন এবং সুন্নত পরিপন্থী কোন কথা বলবেন? অবশ্যই না। এমনটি কখনোই হতে পারে না।

অতএব এটি যখন হতে পারে না তখন প্রত্যেক আহমদীর একথা অনুধাবন করা উচিত যে, মা'রূফ আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে, ভালোবাসা এবং নিষ্ঠাকে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়ে বা চূড়ান্ত মানে উপনীত করে পরিপূর্ণ আনুগত্য করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য সেই অবস্থায়ই হতে পারে যখন যার আনুগত্য করা হয় তার প্রতিটি নির্দেশ সন্ধান করা হয় এবং তা জানার আগ্রহ জন্মে। অতএব আমাদের জন্য এটি আবশ্যক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে যেসব প্রত্যাশা রেখেছেন, যেসব নির্দেশ তিনি দিয়েছেন সেগুলো যেন আমরা সন্ধান করি এবং এর ওপর আমল বা অনুশীলন করার চেষ্টা করি নতুবা এটি শুধু মৌখীক দাবি হবে, আমরা তাঁর (আ.) প্রতিটি নির্দেশ মান্য করি। আমরা যদি না-ই জানি যে, তাঁর নির্দেশ কি বা তিনি কি নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে মানবো কি করে? বা কীভাবে মানা যেতে পারে?

অতএব আহমদী হওয়ার সাথে এই শর্তও রয়েছে, নিজেদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি কর। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একে আরো মজবুত ও সমৃদ্ধ করুন আর আন্তরিকতার সাথে, বিশুদ্ধ চিত্তে নিজেদের জীবনকে সে অনুযায়ী পরিচালনা করার চেষ্টা করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তকে যে নসীহত করেছেন বা উপদেশ দিয়েছেন এবং জামা'তের সভ্য এবং সদস্যদের কাছে যে প্রত্যাশা রেখেছেন তা তাঁর বিভিন্ন বই-পুস্তক এবং রচনাসমগ্রে লিপিবদ্ধ আছে। এখন এর মধ্য থেকে কয়েকটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"আমাদের জামা'তের এমন হওয়া উচিত যে, শুধুমাত্র মুখের কথায় যেন আমরা সীমাবদ্ধ না থাকি অর্থাৎ বাহ্যিকতার ওপর যেন আমরা না থাকি। শুধু মুখের কথা যেন না হয় বা বুলি সর্বস্ব যেন না হই বরং আমরা যেন বয়আতের মূল উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী হই। আর এই সত্যিকার উদ্দেশ্য বা মূল উদ্দেশ্য কী? তিনি (আ.) বলেন, আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সৃষ্টি করা উচিত। শুধুমাত্র মসলা-মাসায়েল দ্বারা তোমরা খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তিনি (আ.) বলেন, প্রত্যেকের উচিত সে যেন নিজের বোঝা বহন করে এবং নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে বা রক্ষা করে।"

অতএব শুধুমাত্র বিশ্বাসগতভাবে নিজের সংশোধন করা বা বয়আত করা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে মেনে নেয়া, বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল বা ধর্মীয় বিতর্কে অন্যের মুখ বন্ধ করে দেয়া, এগুলো কোন মূল্য রাখে না যদি ব্যবহারিক অবস্থায় পরিবর্তন না আসে বা উন্নত না হয়। তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তির পরিবর্তনের জন্য অনেক চেষ্টা কর, সাধনা কর, নামাযে অনেক দোয়া কর। সদকা, খয়রাত এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা "ওয়াল্লাযিনা যাহুদু ফিনা"-র মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। "ওয়াল্লাযিনা যাহুদু ফিনা"-কী? তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা আমাদের পথে চেষ্টা-সাধনা করে তাদের কী হয়? "লানাহ্‌দিইয়ান্নাহুম সুবুলানা" অর্থাৎ আমরা অবশ্যই তাদেরকে নিজের পথের পানে পরিচালিত করব বা হিদায়াত দিব।"

অপর একস্থানে এর আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এটি কি করে হতে পারে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে আলস্য প্রদর্শন করে সেও সেভাবেই খোদার কৃপায় কল্যাণমন্ডিত হবে যেভাবে সেই ব্যক্তি হয় যে নিজের সমস্ত মেধা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং পুরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দ্বারা তাঁর সন্ধান করে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে সন্ধান করে। যে আলস্য প্রদর্শন করে সে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে না।"

অতএব তিনি (আ.) যখন আমাদেরকে বলেন, আমার কথা মানো, আমার পিছনে চল এবং আমার সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখো তখন একথা তিনি এজন্য বলেন যেন আল্লাহ্ তা'লাকে সন্ধান করার পথ তিনি আমাদের দেখাতে পারেন, আমাদের বলতে পারেন যে, কীভাবে আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে পেতে পারি, যেন আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ এবং আশিসের অংশীদার বানাতে পারেন। যেন আমরা নিজেদের নামায সমূহকে নির্ধারিত সময়ে এবং সঠিক ও যথাযথভাবে আদায়কারী হই। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতি লাভ করার জন্য সদকা এবং দান-খয়রাতের প্রতিও যেন মনোনিবেশ করি। মোটকথা তাঁর সাথে সম্পর্ক এবং আনুগত্যের যে বন্ধন তা মূলতঃ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরো সমৃদ্ধ করছে। এরপর অপর একস্থানে তিনি (আ.) আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, "তোমরা দু'টি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখো। প্রথম কথা হলো, তোমরা সত্যিকার মুসলমানের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে দেখাও আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, ইসলামের সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দাও।" তবলীগ কর এবং এই বাণী প্রচার কর। যখন আমাদের নিজেদের জ্ঞান দুর্বল হবে বা কম হবে এবং আমাদের ব্যবহারিক

অবস্থা দুঃশ্চিন্তাজনক হবে তখন আমরা মানুষের জন্য কীভাবে আদর্শে পরিণত হতে পারি। এই অবস্থায় আমরা কীভাবে ইসলামের বাণী এবং ইসলামের উৎকর্ষতা ও সৌন্দর্য্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরব এবং প্রচার করব।

অতঃপর তিনি (আ.) অপর একস্থানে বলেন, "আমাদের জামা'ত এই বেদনায় বেদনার্ত হোক যে, আমাদের মাঝে তাক্বওয়া আছে কি নেই।" আমাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ এবং বেদনা এটিই হওয়া উচিত। অতএব এর জন্য কোন দীর্ঘ বক্তৃতা এবং দীর্ঘ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকে নিজেই আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে পারে, তার চিন্তা পার্থিব জিনিসের জন্য বেশি নাকি ধর্মের উন্নতির জন্য তার চিন্তা বেশি। আর এই দুঃখও শুধু নিজের জন্যই আছে নাকি নিজের সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রেও সেই চিন্তা রয়েছে। খোদা তা'লার ভয় এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি এই মনোযোগ আছে কি নেই। নাকি পার্থিব কোন বিষয় যখন সামনে আসে তখন খোদা তা'লার সন্তুষ্টিও পিছনে পড়ে যায়। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, "দৈনন্দিন কার্যক্রমে অবৈধ বা অন্যায় ক্রোধ এবং রাগ থেকে মুক্ত হওয়া এটিও তাক্বওয়ার একটি শাখা।" যারা সামান্য সামান্য কথায় রেগে যায়, তাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত কেননা, তারাও তাক্বওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এই কয়েকটি হিতোপদেশ আমি আপনাদের সামনে রাখলাম যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের বলেছেন। একথাগুলোর প্রতিই যখন আমরা অভিনিবেশ করবো বা প্রণিধান করবো এবং মনোযোগ দিব তখন এগুলো তাঁর (আ.) সঙ্গে সম্পর্ক এবং ভালোবাসায় আমাদের সমৃদ্ধ করবে। কীভাবে এবং কত বেদনার সাথে তিনি আমাদের ইহ এবং পরকালের জন্য চিন্তা করতেন! একজন পিতার চেয়ে অধিক তিনি আমাদের জন্য চিন্তিত এবং উৎকণ্ঠিত। একজন মমতাময়ী মায়ের চেয়েও বেশি তিনি আমাদের জন্য অস্থির এবং ব্যাকুল। বারংবার তিনি আমাদের উপদেশ দেন যেন কোন না কোন ভাবে আমাদেরকে আমাদের ভুল পথ থেকে মুক্ত করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করতে পারেন। এই চিন্তা এবং ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশের পর এমন কোন কারণ নেই যে, আহমদী হওয়ার দাবিদার প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর (আ.) সাথে সম্পর্ক এবং আনুগত্যের মানকে উন্নত না করবে যাতে সে নিজের ইহ এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করতে পারে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পর আমাদের মাঝে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন আর খিলাফতের ব্যবস্থাপনাও সেই কাজকেই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর অর্পণ করেছিলেন। এই সূত্রে খিলাফতের সাথেও ইখলাস, নিষ্ঠা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের পানে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবো।

যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্তে পরিণত হতে হবে আর ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে। যুগ খলীফার হাতে প্রত্যেক আহমদীই বয়আতের অঙ্গীকার করে থাকেন। অতএব এই অঙ্গীকার রক্ষা করাও আবশ্যক এবং এর জন্য খিলাফতের পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যেসব উপদেশ দেয়া হয়, যে প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী দেয়া হয় তার ওপর আমল করার মাধ্যমেই এই অঙ্গীকার রক্ষা করা যেতে পারে।

বয়আতের সময় প্রত্যেক আহমদী এই অঙ্গীকার করে যে, সে বয়আতের এসব শর্ত পালন করবে আর যুগ খলীফা যেসব মা'রূফ সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তার ওপর আমল করবে। যেমনটি আমি বলেছি, যুগ খলীফার কাজ হলো, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজ আর তাঁর উপদেশকে মানুষের কাছে প্রচার করা, ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানো। অতএব প্রত্যেক আহমদী যখন এই চেতনাসম্মতভাবে নিজেকে গড়ে

প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে জুমুআর খুতবা শোনার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। প্রত্যেক পরিবার নিজের ঘরে জরিপ করে দেখুন! ঘরের প্রত্যেক সদস্য খুতবা শুনেছে কি না? যদি স্ত্রী খুতবা শোনে আর স্বামী না শোনে তাহলে কোন লাভ নেই আর যদি পিতা খুতবা শোনে আর মা এবং সন্তানরা না শোনে এতেও কোন ফায়দা নেই। একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ্ তা'লাই প্রবর্তন করেছেন, এর মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যুগ খলীফার আওয়াজ পৌঁছে যায়। এর অংশে পরিণত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক।

তুলবে তখনই সত্যিকার আনুগত্যের মান প্রতিষ্ঠা পাবে আর জামা'তের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তবলীগের নিত্যনতুন ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে।

প্রত্যেকে যদি এ কথা বলে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আমার সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব এবং বিশ্বাস রয়েছে, আমি তাঁর আনুগত্য করি আর এরপর যদি নিজ নিজ পথ নির্বাচন করতে আরম্ভ করে তাহলে উন্নতি কখনো হতে পারে না। আহমদীয়া জামা'তের সৌন্দর্য্য এতেই নিহিত কারণ, এর মাঝে অর্থাৎ জামা'তে আহমদীয়ার মাঝে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা রয়েছে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে প্রত্যেক আহমদীর যে সম্পর্ক রয়েছে তা এ কারণেই যে, তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাস। পরবর্তীতে খিলাফতের সাথেও এই সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।

গত পরশু যখন আলমেরাতে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয় সেখানে আমি মসজিদের বরাতে ইসলামের শিক্ষা, মসজিদের গুরুত্ব এবং আহমদীদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলেছিলাম। তখন একজন স্থানীয় মহিলা অতিথি একথা প্রকাশ করেছেন যে, খলীফার কথা তো খুবই ভালো, কিন্তু এখন আমরা দেখবো, এখানে বসবাসরত আহমদীরা একথার ওপর কতটুকু আমল করেন এবং প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও শান্তির পরিবেশ কতটা সৃষ্টি করতে পারেন। অতএব মানুষের দৃষ্টিও আপনাদের ওপর রয়েছে। তাই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত।

খিলাফতের বরাতে মানুষ গভীর দৃষ্টি রাখবে। তাই শুধুমাত্র বয়আতের অঙ্গীকার করাই যথেষ্ট নয়। নিজেদের সংশোধনের জন্যও এবং তবলীগের জন্যও আমল বা ব্যবহারিক অনুশীলন প্রয়োজন। সর্বত্র সকল শ্রেণীতে নিজেদের ঐক্য ধরে রাখার বা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং এক হাতের ইশারায় উঠা-বসা করার জন্য খিলাফতের আনুগত্য করাও প্রয়োজন। এ যুগের আহমদীরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন আবিষ্কারাদি ঘটিয়েছেন সেখানে আহমদীদেরকেও এসব সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন। ধর্ম প্রচারের জন্যও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে এসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। টিভি, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা বা রচনাসমগ্র আছে, সেখান থেকে আমরা যখন ইচ্ছা তখনই এসব জিনিস পেতে পারি। এগুলো আমরা বিভিন্ন ভাষায় শুনতেও পারি, দেখতেও পারি অর্থাৎ পড়তেও পারি, সেখানে যুগ খলীফার নসীহত এবং খুতবাগুলোও আমরা শুনতে পারি এবং পড়তে পারি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখার ভিত্তিই হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস আর এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি এসব বই-পুস্তক রচনা করেছেন যা আজ এমটিএ-এর কল্যাণে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে বা পৌঁছাচ্ছে, যা জামা'তকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করার এক নতুন ধারণা বা রূপ দিয়েছে। অতএব আপনাদের প্রত্যেকের এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত এবং প্রত্যেকেরই এই বিষয়টির প্রয়োজন রয়েছে (অর্থাৎ এমটিএ-এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলুন), যাতে আপনারা এই ঐক্যের এবং একতার অংশে পরিণত হতে পারেন।

প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে জুমুআর খুতবা শোনার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। প্রত্যেক পরিবার নিজের ঘরে জরিপ করে দেখুন! ঘরের প্রত্যেক সদস্য খুতবা শুনেছে কি না? যদি স্ত্রী খুতবা শোনে আর স্বামী না শোনে, তাহলে কোন লাভ নেই আর যদি পিতা খুতবা শোনে আর মা এবং সন্তানরা না শোনে, এতেও কোন ফায়দা নেই। একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাপনা, যা আল্লাহ্ তা'লাই প্রবর্তন করেছেন, এর মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যুগ-খলীফার আওয়াজ পৌঁছে যায়। এর অংশে পরিণত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক।

অতএব এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিন। যদি আমরা এটিই না জানি যে কি বলা হচ্ছে, তাহলে আনুগত্য কি করে হবে। কথা শুনলেই আনুগত্যের যোগ্য হবেন। অতএব এসব বিষয়ের সন্ধান করুন, সেসব কথা সন্ধান করুন যার আনুগত্য করতে হবে, নতুবা এগুলো শুধুমাত্র মৌখীক দাবি হবে আর বাহ্যিক ঘোষণা হবে মাত্র। ইজতেমায় দাঁড়িয়ে বা বয়আতের সময় এই ঘোষণা দেয়া যে, আপনি যে মা'রূফ সিদ্ধান্তই প্রদান করুন না কেন, তার অনুসরণ করা ও অনুগত্য করা আমরা আবশ্যক জ্ঞান করব আর মহিলা হয়ে থাকলে তারা নিজেদের ভাষায় বলবে, আনুগত্য অবশ্যই করব অথবা আহমদীয়া খিলাফতের দৃঢ়তার জন্য আমরা চেষ্টা করতে থাকব। আল্লাহ্ করুন, প্রত্যেক পরিবার যেন এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তরবীয়তের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছেন, এথেকে যেন আমরা পরিপূর্ণরূপে লাভবান হই। আর শুধুমাত্র তরবীয়তই নয় বরং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রেও এটি (এমটিএ) অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোন কারণে যদি লাইভ বা সরাসরি খুতবা শোনা সম্ভব না হয় তাহলে রেকর্ডিং শুনতে পারেন। ইন্টারনেটেও খুতবাগুলো রয়েছে। এছাড়া আরো অনেক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, বিশেষভাবে খুতবা এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানাদি।

আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দিন। যেখানে আপনারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হবেন, সেখানে তাঁর (আ.) পর যে খিলাফতের প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার সাথেও যেন সুদৃঢ় সম্পর্ক হয় আর খিলাফতের আনুগত্যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী হোন। মহানবী (সা.)-এর হাদীস অনুসারে এই সম্পর্ক এবং এই আনুগত্য পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যকারী এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানাবে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো, যা আমাদের মুরুব্বী মোকাররম মোহাম্মদ হাফেয ইকবাল ওড়ায়েচ সাহেবের, যিনি গত ২রা অক্টোবর ২০১৫ সনে এক দুর্ঘটনায় ৪৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে

ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। গত ২রা অক্টোবর সকাল বেলা তিনি একাই তার পিতৃপুরুষের গ্রাম চকপুনিয়ারে নিজের চাচার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। ভালওয়ালের কাছে রেললাইন ক্রস করার সময় তিনি সম্ভবত দেখেন নি, ট্রেন আসে এবং তাকে ও তার গাড়িকে হিচড়ে নিয়ে যায় বা সংঘর্ষ হয়। যাহোক, বাহ্যিকভাবে তার শরীরে কোন আঘাত লাগেনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। এ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠানো হয় বা গাড়ি চেয়ে পাঠানো হয় এবং তাকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানো হয় কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছিয়েও তার প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয় নি।

হাফেয মোহাম্মদ ইকবাল সাহেবের দাদার নাম ছিল চৌধুরী ফযল আহমদ সাহেব। তার বড়দাদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল চৌধুরী আল্লাহ্ বক্স সাহেব। ১৯০১ সনে তার বড়দাদা বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তার বড়দাদার পূর্বের নাম ছিল রসূল বক্স। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা পাল্টে আল্লাহ্ বক্স রেখেছিলেন। তার পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ ওড়ায়েচ সাহেবও অবসর গ্রহণের পর জীবন উৎসর্গ করে দীর্ঘদিন রাবওয়াতে জামা'তের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেছেন। হাফেয সাহেব অর্থাৎ মুরুব্বী সাহেব রাবওয়াতেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি কুরআন হিফ্য করেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। এছাড়া তিনি আরবী এবং উর্দূতে ফাযেল ডিগ্রি অর্জন করেন।

পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে তিনি কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে এতিমদের দেখা-শোনার জন্য জামা'তের যে কমিটি রয়েছে তিনি সেই কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার পাঁচজন সন্তান রয়েছে। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। দুই সন্তান এখনও ছোট, একজনের বয়স সতের এবং অপর জনের বয়স দশ বছর। তার ভাই জনাব তাহের মেহদী ইমতিয়াজ সাহেবও সিলসিলাহ্র মুরুব্বী এবং বর্তমানে যিয়াউল ইসলাম প্রেস রাবওয়ার ম্যানেজার। কিন্তু আল্ ফযলের ওপর যখন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় তখন তার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয় যে কারণে কয়েক মাস ধরে বা দীর্ঘদিন যাবত তিনি জেলে বন্দী আছেন। আল্লাহ তা'লা দ্রুত তার মুক্তির ব্যবস্থা করুন। কেননা, আদালতই অত্যন্ত ভীতু। জজ প্রথমে জামিন দিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে মৌলভীদের ভয়ে তা বাতিল করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও ইনসাফ তথা ন্যায়বিচারের তৌফিক দিন আর যেসব নিষ্পাপ জেলে বন্দী আছেন, আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

মাহবুব আহমদ রাযেকী সাহেব, যিনি সাদউল্লাহ্পুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট, তিনি বলেন, ২০০৩ সনে যখন সাদউল্লাপুরে জামা'তের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বা খারাপ ছিল, তখন এখানে মুরুব্বী হিসেবে হাফেয ইকবাল সাহেবের পোস্টিং হয়। অ-আহমদী বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যার ফলে বিরুদ্ধবাদীরা শুধুমাত্র বিরোধিতা থেকেই বিরত হয় নি বরং এমন একজন, যে অনেক বড় বিরুদ্ধবাদী এবং নেতৃস্থানীয় ছিল, আহমদীয়াতের বিরোধিতা করার কারণে সে ক্ষমাও চেয়েছিল। এদিক থেকেও তিনি তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছেন এবং সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করেছেন।

এটি ভিন্ন কথা যে, পাকিস্তানে ভয়ের কারণে, (মোল্লাদের ভয়ে বা সমাজের ভয়ে ভীত হয়ে) অনেক বড় একটি শ্রেণী যারা আহমদীয়াতকে পছন্দ করেন এবং জামা'তের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার রয়েছে সেটিকে অপছন্দ করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা ঘোষণা দিতে পারে না। তবে আল্লাহ্ তা'লা ছোট ছোট এলাকায় এমন ব্যবস্থা করে থাকেন, বা এমন সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন যেখানে মানুষ প্রকাশ্যেও স্বীকৃতি দেয়। তিনি বর্তমানে যে অফিসে কর্মরত ছিলেন বা জামা'তের সেবা করছিলেন, সেখানকার একজন কর্মী মজিদ সাহেব বলেন, মুরুব্বী হিসেবে হাফেয সাহেব যেখানেই কর্মরত ছিলেন, সেখানকার সদস্যদের সাথে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যোগাযোগ বহাল রেখেছেন। মানুষ তার কাছে আসতো, তার পরামর্শ নিত এবং তিনি তাদেরকে সাহায্যও করতেন। এটি তার অনেক বড় একটি গুণ ছিল। কেন্দ্রের অর্থ সাশ্রয় করার প্রতি সর্বদা তার চেষ্টা ছিল অর্থাৎ কেন্দ্রের অর্থ যেন সঠিক জায়গায় বা যথাযথ স্থানে খরচ হয়। আর বিধবাদের গৃহ নির্মাণের জন্য তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন এবং এই চেষ্টাও করতেন যেন স্বল্পমূল্যে ঘর বানানো সম্ভব হয়। যেখানে নির্মাণ কাজ হতো সেখানে অনেক সময় তিনি যদি ঘটনাচক্রে পৌঁছে যেতেন, তাহলে সেখানে গিয়ে তিনি নিজেই মিস্ত্রীদের সাথে কাজে লেগে যেতেন।

লন্ডনে অবস্থিত আমাদের রাশিয়ান ডেস্কের খালেদ সাহেব বলেন, তিনি তার সহপাঠি ছিলেন এবং অত্যন্ত অতিথিসেবক ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বলেন, একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, তার মাঝে তবলীগের খুবই আগ্রহ এবং উদ্দীপনা ছিল। সম্ভবত তিনি যখন সাদেকাবাদ বা সাদউল্লাহ্পুরে কর্মরত ছিলেন, সেখানে একটি রাশিয়ান কোম্পানি কোন প্রজেক্টে কাজ করছিল। রাশিয়ান ভাষা না জানা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে তবলীগ করতেন। খালেদ সাহেব যেহেতু রাশিয়ায় থেকে ভাষা শিখেছিলেন, তাই তিনি যখন পাকিস্তান যান, তখন তার কাছ থেকে তিনি কিছু বাক্য শিখে নেন। এরপর তিনি নিজেই রুশ ভাষার কিছু বাক্য উর্দূ ফনেটিকে লিখে রাখেন যেন তবলীগ করতে পারেন। তবলীগের জন্য এমনই উদ্যম এবং উচ্ছাস তার মাঝে ছিলো।

আল্লাহ্ তা'লা সব মুরব্বীকে তৌফিক দান করুন, তারা যেন অবস্থা এবং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, তবলীগের নিত্য-নতুন পথ খুঁজে বের করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুম হাফেয সাহেবের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার স্ত্রী-সন্তানদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করুন এবং তার পুণ্যকর্ম সমূহ অবলম্বন করার তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(১৮তম কিস্তি)

বয়স্কদের সেবাযত্ন

বয়স্কদের সেবাযত্নের দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রের ওপরে চলে যাচ্ছে। বয়স্কদের সেবা-যত্ন জাতীয় অর্থনীতির ওপরে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু, এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যত বেশী খরচই করুক না কেন, তা তাদের জন্য শান্তিও তৃপ্তি বয়ে আনতে পারবে না। প্রত্যাখ্যাত বা পরিত্যক্ত হওয়া অথবা ফেলে দেওয়া মানুষের মর্মান্তিক অনুভূতি এবং গভীর বেদনাদায়ক উপলব্ধি এবং অন্তরে ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতা ইত্যাদি এমন সব সমস্যা, যা পুরণ করাই সম্ভব নয়। কোন পরিবার তাদের কোন দূর-আত্মীয়ের দেখাশোনা করবে, এমন কথা ইদানিং কল্পনাও করা যায় না।

সময় যতই বয়ে যাচ্ছে, আধুনিক সমাজে বয়স্কদের জন্য 'হোম' বা গৃহের প্রয়োজনীয়তা ততটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে সব সময় প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, এমনকি সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য নূন্যতম প্রয়োজনও মেটানো যাচ্ছে না। দৈহিক রোগ-ব্যাধির নিরাময় তো করা যায়, কিন্তু গভীর মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের উদ্বেগ, যার দরুন আধুনিক সমাজগুলোতে বেশ বড় এক সংখ্যার লোকরা ভুগছে, তার চিকিৎসা করা অনেক দুরূহ ব্যাপার।

মুসলিম-প্রধান দেশগুলোতে মূল্যবোধের অবক্ষয় যতই ঘটুক না কেন, তেমন অবস্থা চিন্তাও করা যায় না, যা বাদবাকী সমসাময়িক সমাজগুলোতে বিরাজ করছে। এসব দেশে বৃদ্ধ বা বয়স্কদেরকে শ্রদ্ধাহীন বা নির্দয়ভাবে দেখাশোনা করাটাকে মনে করা হয় অমর্যাদাকর ও অসম্মানজনক। রাষ্ট্র যদিও তাদের সেবাযত্নের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে, তবুও বয়স্ক আত্মীয়-স্বজনকে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়াটা বহু মুসলমানের কাছে একটা লজ্জার ব্যাপার।

কাজেই গৃহের এবং পরিবারের মধ্যে একজন মুসলিম নারীর যে ভূমিকা, তা তার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলেও শেষ হয়ে যায় না। ভবিষ্যতের সঙ্গে সে যেমন গভীর বন্ধনে আটকা থাকে, তেমনি আটকা থাকে সে অতীতের সঙ্গেও। এটা তার সেই দয়া ও মানবিক বোধ, এবং যাদের সেবা-যত্নের দরকার তাদেরকে দেখাশোনা করবার সেই সহজাত ক্ষমতা, যা প্রয়োজনে বয়স্কদের উদ্ধারের জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা তখন আগের মতই কদর পায়, শ্রদ্ধাস্পদ থাকে এবং পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই থাকে। তাদের দেখাশোনার ব্যাপারে 'মা' একটা বড় ভূমিকা পালন করেন। তাদেরকে সঙ্গ দান করেন চাকরানীরূপে লাচার হয়ে নয়, বরং মানবীয় সম্পর্কের প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক আগ্রহ-অনুভূতি নিয়ে। ফলে, তিনিও নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তিনি নিজে যখন বৃদ্ধ হবেন, তখন এই সমাজ তাকে উৎখাত করে দেবে না বা একটা পুরাতন বস্তু মনে করে ফেলে দিবে না।

অবশ্য প্রত্যেক সমাজেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম আছে, এবং এমন কিছু মুসলিম পরিবারও আছে, যেগুলোতে অতীতের পুরোনো অবশিষ্টাংশ সব কিছুকেই বিরক্তিকরও বোঝাস্বরূপ মনে করা হয়, বিশেষতঃ যে পরিবারগুলো তথাকথিত আধুনিক প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত। তবে সামগ্রিকভাবে, অন্য সব সমাজের মত মুসলিম সমাজগুলোতে পরিত্যক্ত পিতামাতার জন্য 'হোম' বা গৃহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তেমন একটা দেখা দেয় নি।

এ প্রসঙ্গে একটা মজার কথা আমার মনে পড়লো। কথাটা শুনে হয়তো অনেকেই হাসবেন, তবে অনেকের চোখে পানিও আসতে পারে। একটা বাচ্চা ছেলে তার দাদার প্রতি তার পিতার দুর্ব্যবহার দেখে মনে মনে খুব দুঃখ ও অস্বস্তি বোধ করতো। সে প্রথম একবার দেখলো যে, তার পিতা তার দাদাকে একটা ভাল আরামদায়ক কক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা কম আরামদায়ক কামরায় থাকতে দিল এবং এমনিভাবে একটার পর একটা কামরা বদলাতে বদলাতে অবশেষে তার দাদাকে চাকর-বাকরদের একটা ঘরে জায়গা করে দিল। প্রচণ্ড শীতের এক মৌসুমে একবার তার দাদা তার কষ্ট ও অসুবিধার কথা জানিয়ে বল্লো যে, এই কামরাটা তো ভীষণ ঠাণ্ডা, তাছাড়া তার কাছে তো তেমন লেপ-কাঁথাও নেই, সে থাকবে কী করে। এতে ছেলেটির পিতা পুরান ছেঁড়া-ফাঁড়া কাপড়ের একটা বোচকা খুলে খুঁজতে লাগলো, কোন কম্বল-টম্বল পাওয়া যায় কিনা। অবস্থাটা দেখে ছেলেটি তার বাবার কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে বললো, 'বাবা! সব ছেঁড়া-ছুটা কাপড়গুলোই দাদাকে দিও না, আমার জন্যে কিছু রেখে দিও, নইলে আমি আবার তোমাকে দিব কি, যখন তুমি বুড়ো হবে!'

বলাই বাহুল্য, বাচ্চাটার অসন্তোষের এই নির্দোষ প্রকাশের মধ্য দিয়েই ফুঠে উঠেছে বর্তমান যামানার বয়োবৃদ্ধ প্রজন্মের দুঃসহ দুঃখ আর মর্মবেদনা।

মুসলিম সমাজগুলোতে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে তাকে ঠিক তেমনি ব্যতিক্রমী বা অতি বিরল বিরল ঘটনা বলা হবে, যদি

আধুনিক সমাজগুলোর কেউ বা কোন আত্মীয়-স্বজন কোন বয়স্ক ব্যক্তির সেবা-যত্ন করে।

"এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্‌ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের উভয়কেই তুমি 'উফ্' পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক ও মমতাপূর্ণ কথা বলবে। মমতার সাথে তুমি তাঁদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম করো, যেভাবে তারা তোমাকে তোমার ছোটবেলায় প্রতিপালন করেছিলেন।" (বনী ইসরাঈল- ১৭:২৪-২৫)

আলোচ্য বিষয়ের জন্য এই আয়াত দু'টো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার একত্বের পরে- আর সবকিছুর মধ্যে সর্বপ্রথম তাদেরকে ভালবাসা, স্নেহ-মমতা ও দয়ামায়া প্রকাশের মাধ্যমে দৃষ্টি দেওয়া। তাদের প্রতি, যাঁরা বৃদ্ধ বয়সের কঠিন সময়ে উপনীত হয়েছেন।

অধিকন্তু, এই আয়াত দু'টিতে সেই পরিস্থিতিরও উল্লেখ করা হয়েছে যখন পিতামাতা উভয়ের বা তাদের একজনের আচরণ অত্যন্ত রূঢ় এবং কখনও কখনও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তখন এর প্রতিক্রিয়ায় যেন তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তির কোন সামান্যতম প্রকাশও কারো ঠোঁটে উচ্চারিত না হয়। বরং সে অবস্থায়ও যেন তাদের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন অক্ষুন্ন থাকে।

দু'টি প্রজন্মের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্কের ওপরে যে জোর দেওয়া হয়েছে, তা ক্রমাগতভাবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে চলেছে যে, কোনও প্রকার প্রজন্ম-ব্যবধান বা 'জেনারেশন-গ্যাপ' সৃষ্টি হবে না। কেননা, এই ধরনের জেনারেশন-গ্যাপ সব সময়েই পারস্পরিক ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের আদান-প্রদানের গতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

সুতরাং ইসলামের সামাজিক দর্শন এই শিক্ষা দেয় যে, কোন প্রজন্ম যেন তার ও তার পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে কোন ব্যবধান সৃষ্টি হতে না দেয়। প্রজন্ম-ব্যবধান বা জেনারেশন-গ্যাপের কোন স্থান ইসলামে নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী পরিবারের যে ধারণা, তা শুধু একটি বাড়ীর সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিম্নোক্ত আয়াতেও মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন কেবল পিতামাতার জন্যই খরচ না করে, বরং তারা যেন নিকট আত্মীয়-স্বজনদের জন্যেও খরচ করে। অগ্রাধিকারের কারণে পিতামাতার পরে এদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে এইজন্যে যে, এতে করে যেন পিতামাতার মর্যাদা হানি না হয় এবং পারস্পারিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

"এবং তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত করবে এবং তার সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক করবে না এবং সদয় ব্যবহা করবে পিতামাতার সাথে এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকিন এবং আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে এবং সঙ্গী সহচর এবং পথচারীগণের সাথে এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে, তাদের সাথে। আল্লাহ্ তাদেরকে আদৌ ভালবাসেন না, যারা অহংকারী (এবং) দাম্ভিক।" (আন্ নিসা- ৪:৩৭)

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে যে, তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণে মনোযোগী হতে হবে।

সমসাময়িক সমাজগুলো যদি এই সমস্ত নির্দেশাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে এমন বহু সমস্যা, যা আজ পরিদৃষ্ট হচ্ছে এবং যা উন্নত সমাজের জন্য কলংকস্বরূপ, তার সবই মিটে যাবে। বয়স্কদের জন্য কোন 'হোম' এর প্রয়োজন হবে না। কেবলমাত্র তাদের জন্য ছাড়া, দুর্ভাগ্যবশতঃ যাদের দেখাশোনা করার মত কোনও নিকট আত্মীয় নেই। ইসলামী এক সমাজে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে ভালবাসার ওপরে বারবার এত বেশী জোর দেয়া হয়েছে যে, কোন সন্তানের পক্ষে তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খাতিরে তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব।

(চলবে)

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

‘আখলাকে আহমদ’ অর্থাৎ ‘আহমদ’-এর চারিত্রিক গুণাবলী

মওলানা মুহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ

(২য় কিস্তি)

[‘আখলাকে আহমদ’ পুস্তিকাটি হযরত হযরত মির্যা নাসের আহমদ(রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে আহমদী শিশু-কিশোরদের তালীম তরবিয়তের উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সনে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশ করা হয়।]

ধর্মীয় আত্মাভিমান

(১) শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব বর্ণনা করেন, “একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ সফরে ছিলেন এবং লাহোর স্টেশনের পাশেই একটি মসজিদে অজু করছিলেন। হুযূরের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঠিক তখন পণ্ডিত লেখরাম আসল এবং সালাম দিল কিন্তু হযরত সাহেব কোন উত্তর দিলেন না। পণ্ডিত লেখরাম ভাবল হয়তোবা মির্যা সাহেব শুনতে পান নি তাই সে আরেক দিকে সরে গিয়ে পুনরায় আবার সালাম দিল। কিন্তু তিনি(আ.) এরপরও ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এরপর সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, হুযূর! পণ্ডিত লেখরাম সালাম দিয়েছিল।

তিনি(আ.) আত্মাভিমানের সাথে বললেন, সে একদিকে আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ(সা.)-কে গালি দেয় আবার আমাকে সালাম দেয়!” (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১)

(২) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি(রা.) বর্ণনা করেন, “১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আর্যরা যখন লাহোরে একটি সমাবেশ করেছে, যেখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এ উপলক্ষে হযরত সাহেবও তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি প্রবন্ধ লিখে হযরত মৌলভী সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল(রা.)-এর নেতৃত্বে জামাতের কয়েকজন সদস্যকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু আর্যরা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নিজেদের প্রবন্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর বিষয়ে অত্যন্ত নোংরা ভাষা ব্যবহার করেছে। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর কর্ণগোচর হয়, তখন হযরত সাহেব তার এই প্রতিনিধি দলের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, আমার জামাতের সদস্যরা কেন এমন সভা থেকে উঠে চলে আসে নি। তিনি(আ.) বলেন, কোন সভায় মুহাম্মদ(সা.)-কে মন্দ বলা হবে আর একজন মুসলমান সেখানে বসে থাকবে– এটা চরম পর্যায়ের আত্মমর্যাদাহীনতা। তিনি(আ.) একথা বলার সময় রাগে তার চেহারা রক্তিম হয়ে গিয়েছিল আর তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলেন, আমার জামাতের সদস্যরা কেন ধর্মীয় আত্মাভিমান দেখাল না। তারা যখন গালি-গালাজ শুরু করেছিল, তখনই সেই সমাবেশ থেকে উঠে চলে আসা উচিত ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.) বলেন, আমি তখন একবার উঠতেও চেয়েছিলাম, কিন্তু হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন(রা.)-এর কারণে বসে গেলাম।” (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৬)

আতিথেয়তা

(১) মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানৌরী(রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বাইতুল ফিকরে শুয়ে ছিলেন আর আমি তাঁর পা টিপে দিচ্ছিলাম। ঠিক তখন লালা শরমপৎ বা লালা মালওয়ামাল এসে ঘরের দরজার কড়া নাড়লেন। আমি উঠে কবাট খুলতে যাই, কিন্তু হযরত সাহেব দ্রুত উঠে গিয়ে আমার আগেই শিকল খুলে দিলেন এবং এরপর এসে নিজের জায়গায় বসলেন। তিনি বললেন, দেখুন আপনি আমাদের মেহমান আর মহানবী(সা.) বলেছেন, মেহমানের সম্মান করা উচিত।” (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৯)

(২) কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ পেশাওয়ারী সাহেব বর্ণনা করেন, “একবার আমি এবং আব্দুর রহীম খান সাহেব(রা.) মসজিদ মুবারকে খাবার খাচ্ছিলাম। এসব খাবার হযরত মির্যা সাহেবের ঘর থেকে এসেছিল। হঠাৎ আমার দৃষ্টি একটি মাছির ওপর পড়ল আর আমি তৎক্ষণাৎ খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলাম। হযরত সাহেবের ঘরের এক সেবিকা এসে সেই খাবার তুলে নিয়ে যায়। হযরত মির্যা সাহেব বাড়ির অভ্যন্তরে খাবার খাচ্ছিলেন। সেই সেবিকা হযরত সাহেবকে

পুরো ঘটনা বলে দিলেন। এটি শোনামাত্রই হযরত সাহেব নিজের সামনের খাবার সেই সেবিকার হাতে তুলে দিলেন এমনকি নিজের হাতে যে খাবারটুকু ছিল তাও তুলে দিয়ে বললেন, যাও! এই খাবার নিয়ে তাকে খেতে দাও। সেবিকা আনন্দের সাথে সেই খাবার আমাদের কাছে নিয়ে এসে বলল, নিন হযরত সাহেব আপনাদের জন্য তাবাররুক পাঠিয়েছেন।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৩৬)

(৩) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "মৌলভী মুহাম্মদ আলী এম এ সাহেবের জন্য হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ(আ.) নিজে সকাল বেলায় গ্লাসে দুধ ঢেলে তাতে মিস্রি মিশিয়ে তা বিশেষভাবে প্রস্তুত করে পাঠাতেন। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৭৭)

(৪) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) আরো বর্ণনা করেন, একবার রমযান মাসে লাহোর থেকে কিছু লোক কাদিয়ান আসল। হযরত মির্যা সাহেব যখন এ সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে তৎক্ষণাৎ কিছু নাস্তা নিয়ে মসজিদে চলে গেলেন। মেহমানগণ নিবেদন কররেন, আমরা তো সবাই রোযা। তিনি(আ.) বললেন, সফরে রোযা রাখা ঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'লা যে সুযোগ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা উচিত। অতঃপর তিনি তাদেরকে নাস্তা করিয়ে রোযা ভাঙালেন। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৮)

(৫) হাফেজ নবী বখশ সাহবে(রা.) বর্ণনা করেন, 'একবার আমি কাদিয়ান আসলাম। সেসময় বাইতুল ফিক্‌রে ছোট্ট একটি চারপাই থাকত আর সেই কক্ষে কাহওয়া প্রস্তুত করাই থাকত আর তার পাশে মিস্রিও থাকত। আমি দিনে যতবার চাইতাম কাহওয়া বা চা পান করে নিতাম। হুযূর বলতেন, ঠিক আছে আরো পান কর।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৪৪)

(৬) কাশ্মীর নিবাসী খাজা আব্দুর রহমান সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, তার পিতা বর্ণনা করেছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বাইরে একই দস্তরখানে সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে খাবার খেতেন। এতে করে অন্যদের মতই কাশ্মিরীরাও খাবার পেত। একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) খাবার পরিবেশককে নির্দেশ দিলেন, কাশ্মীরের লোকরা সাধারণত একটু বেশী খাবার খেতে অভ্যস্ত তাই তাদেরকে বেশী করে খাবার দিবে। এরপর থেকে আমরা বেশী করে খাবার পেতাম। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৮২৪)

(৭) হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "এক রাতের কথা, কিছু মেহমান আসল, যাদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য হযরত উম্মুল মোমেনীন(রা.) এদেরকে কোথায় ঘুমোতে দেয়া যায় এ নিয়ে খুবই বিচলিত হচ্ছিলেন। তখন মেহমানকে সম্মান করার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) পাখির একটি গল্প শুনালেন। তিনি বলেন, একদা একজন মুসাফির জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেল। অন্ধকার রাত ছিল আশপাশে কোন বাড়ি-ঘরও দেখা যাচ্ছিল না। এই নিরুপায় মুসাফের তখন রাত কাটানোর জন্য একটি গাছের নিচে বসে রইল। সেই গাছের উপরে একটি পাখির বাসা ছিল। পাখি তার সঙ্গিনীকে বলল, দেখ! আমাদের বাসার নিচে এই মুসাফের মাটিতে বসে আছে। সে আজ আমাদের মেহমান। তার আতিথেয়তা করা আমাদের দায়িত্ব। সঙ্গিনী তখন এতে একমত হয়ে পরামর্শ করতে লাগল। শীতের রাত, আমাদের মেহমানের নিশ্চয় আগুনের প্রয়োজন অথচ আমাদের কাছে তো তেমন কিছুই নেই। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, চল আমরা আমাদের বাসা ভেঙে নিচে ফেলে দিই যেন এটিকে জ্বালিয়ে উত্তাপ গ্রহণ করতে পারে।

অতঃপর তারা এমনটিই করল এবং সেই বাসার সব খরকুটা নিচে ফেলে দিল। সেই মুসাফের এটিকে লুফে নিল আর এসব খড়কুটা একত্র করে আগুন জ্বালিয়ে উত্তাপ গ্রহণ করতে লাগল। তখন গাছের সেই পাখির জোড়া আবার পরামর্শ করতে লাগল যে, আমরা তো আমাদের মেহমানকে আগুনের ব্যবস্থা করে দিলাম, যার মাধ্যমে মুসাফের উত্তাপ গ্রহণ করছে। কিন্তু আমাদের তো তাকে কিছু খাবারও দেয়া প্রয়োজন। আমাদের কাছে তো কিছুই নেই চল আমরা নিজেরাই এই আগুনে ঝাপ দেই যেন মুসাফের আমাদেরকে পুড়িয়ে আমাদের মাংস খেতে পারে। অতঃপর তারা উভয়ে এমনই করল এবং অতিথির আতিথেয়তার ব্যবস্থা সুচারুরূপে করল।" (যিকরে হাবীব: পৃষ্ঠা ৮৬)

(৯) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, "প্রথম দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বেশ কিছুদিন দু' বেলার খবার মেহমানদের সাথে বাইরে খেতেন। খাবার খওয়ার সময় কখনও কখনও আব্দুল করীম সাহেব বলতেন, এখন আচার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে আর কোন সেবকের দিকে ফিরে আচার দিতে ইশারা করতেন। হুযূর নিজেই তৎক্ষণাৎ দস্তরখানা থেকে উঠে বাইতুল ফিকরের ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যেতেন আর আচার নিয়ে আসতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৯৯)

(১০) শেঠি গোলাম নবী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি প্রথম যখন কাদিয়ান আসি, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) উপর তলায় থাকতেন। আমি গিয়ে আস্‌সালামু আলাইকুম বললাম। হযরত সাহেব উত্তর দিয়ে করমর্দন করে বললেন, বসুন। আমি চারপাই বা চকিতে বসে পড়লাম। হযরত সাহেব সিন্দুক খুলে মিস্রি বের করে গ্লাসে দিলেন, এরপর পানি ঢেলে কলম দিয়ে মিস্রি মিশিয়ে তার পবিত্র হাতে আমাকে সেই শরবত পান করতে দিলেন। তিনি বললেন, আপনি গরমের মাঝে এসেছেন, এই শরবত পান করে নিন'। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬৮)

অনুসারীদের সাথে আচরণ

(১) মৌলভী শের আলী সাহেব(রা.) বর্ণনা

করেন, এমনিতে হযরত সাহেব সকলকেই খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু আমি অনুভব করতাম, তিনি(আ.) মুফ্‌তি সাহেবকে বিশেষভাবে ভালোবাসতেন। মুফ্‌তি সাহেবর উল্লেখ যখনই হত, তখনই তিনি বলতেন, 'আমাদের মুফ্‌তি সাহেব'। আর মুফ্‌তি সাহেব যখন লাহোর থেকে কাদিয়ান আসতেন, তখন হযরত সাহেব তাকে দেখে খুবই আনন্দিত হতেন।" (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩)

(২) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, মৌলভী আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদতের পর তার কোন ভক্ত কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর নিকট আব্দুল লতীফ সাহেবের কিছু চুল নিয়ে আসে। সেই চুল তিনি(আ.) একটি ছোট বোতলে রেখে তাতে কস্তুরি দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করে রেখে দেন। এরপর এই শিশিটিতে সুতা বেঁধে বাইতুদ দোয়ার একটি খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে দেন। এসব কাজ তিনি এমনভাবে করেছিলেন যে, স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি এই চুলকে তাবাররুক মনে করতেন আর বাইতুদ দোয়াতে হয়তো একারণে ঝুলিয়েছেন যেন, দোয়ার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৮)

(৩) শেঠি গোলাম নবী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, যখন আইনায়ে কামালাতে ইসলাম ছাপা হচ্ছিল, তখন আমি কাদিয়ান এসেছি আর যখন আমি ফিরে যাচ্ছিলাম তখন পর্যন্ত এই পুস্তকের আশি পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশিত অংশটুকুই আমি নিজের সাথে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম আপত্তি করলেন যে, পুস্তক সম্পূর্ণ ছাপা না হলে দেয়া যাবে না। তখন হুযূর(আ.) বললেন, যতটুকুই ছেপেছে, তা মিঞা গোলাম নবী সাহেবকে দিয়ে দাও আর নোট করে নাও, পরবর্তীতে অবশিষ্টাংশ পাঠানো হবে। আর আমাকে বললেন, সম্পূর্ণ পুস্তক প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত এটি প্রচার করবে না।" (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৭)

(৪) ফয়জুল্লাহ্ চক নিবাসী হাফেজ নবী বখশ সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, আমার ছেলে আব্দুর রহমান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষানবিস ছিল। সে মারা গেল। আমি খবর পেয়ে কাদিয়ান আসলাম আর মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব জানাযা নামায পড়ালেন। এরপর আমি ফয়জুল্লাহ চকে ফিরে গেলাম। এরপর পরবর্তী শুক্রবার কাদিয়ান আসলাম। আমি মসজিদ মুবারকে গেলাম। যখন হুযূরের স্নেহের দৃষ্টি আমার প্রতি পড়ল হুযূর বললেন, সামনে চলে আস। হুযূর একথা বলা মাত্রই সবাই আমার জন্য রাস্তা করে দিল। আমি বসা মাত্রই হুযূর অত্যন্ত ভালবাসার সাথে বললেন, আমি জানতে পেরেছি আপনি আপনার সন্তানের মৃত্যুতে অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এর বিনিময়ে আমি আরো উত্তম প্রতিদানের জন্য দোয়া করর। অতঃপর এই দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তালা আমাকে আরেকটি পুত্র-সন্তান দান করলেন।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০১)

(৫) মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ান আসলাম। আমার সাথে আমার সম্মানিতা মা-ও ছিলেন। হযরত সাহেবের হাতে বয়াত নেয়ার উদ্দেশ্যে আমার মা ভেরা থেকে আসছিলেন। আর এবছরই তিনি হযরত সাহেবের হাতে বয়াত করেছিলেন। আমরা যখন ফিরে যেতে লাগলাম, তখন হযরত সাহেব আমাদের টমটমে উঠার জায়গা পর্যন্ত গেলেন। তিনি আমাদের জন্য খাবারও আনালেন যেন আমরা সাথে নিয়ে যেতে পারি। লঙ্গরখানার লোকরা খাবার কোন কাপড়ে বেঁধে দেয় নি। এটি দেখে হযরত সাহেব নিজের পাগড়ির প্রায় এক গজ কাপড় ছিড়ে এতে রুটিগুলো বেঁধে দিলেন। (যিকরে হাবীব: পৃষ্ঠা ৪৫)

উপঢৌকনের কৃতজ্ঞতা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেবের জন্য যখনই কোন ব্যক্তি কোন উপঢৌকন নিয়ে আসত তখন তিনি(আ.) তার অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন আর বাড়িতেও তার আন্তরিকতার উল্লেখ করতেন আর বলতেন, অমুক ব্যক্তি এই জিনিষটি পাঠিয়েছে। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১৩)

শত্রুর সাথে আচরণ

(১) হযরত উম্মুল মোমেনীন(রা.) বর্ণনা করেন, "একবার মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেবের প্রচণ্ড জ্বর হয়। তার মাথায়ও এর প্রভাব পড়ে। তখন কোন ডাক্তার বা চিকিৎসকও এখানে ছিল না। মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেবের স্বজনরা যখন হযরত সাহেবকে খবর দিলেন, তখন তিনি কালক্ষেপণ না করে তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন আর যতদূর সম্ভব চিকিৎসা করলেন। এতে রোগির উপকারও হল। অথচ তখন চরম শত্রুতা ছিল। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১১)

(২) মৌলভী শের আলী সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, মার্টিন ক্লার্কের মামলায় মৌলভী ফজলুদ্দীন লাহোরী হুযূরের পক্ষে উকীল ছিলেন আর এ ব্যক্তি অ-আহমদী ছিলেন। হযরত সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেয়ার জন্য মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন বাটালভী যখন উপস্থিত হল, তখন মৌলভী ফজলুদ্দীন হযরত সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি অনুমতি থাকে তাহলে আমি মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন সাহেবের পূর্বপুরুষের বিষয়ে কোন প্রশ্ন করব। হযরত সাহেব কঠোরভাবে বারণ করে বললেন, আমি কখনও এর অনুমতি দিচ্ছি না। তিনি আরো বললেন, লা ইউহিব্বুল্লাহুল জাহরা বিস্‌সূ' মন্দ কর্মের প্রকাশ আল্লাহ্ তালা পছন্দ করেন না। এ কথায় তার উপর খুবই প্রভাব পড়ে। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮)

দান-দক্ষিণা

(১) মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সাহেব একবার বাহির থেকে বাড়ির অভ্যন্তরে যাচ্ছিলেন তখন কোন এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে কিছু সাহায্য

চাইল। কিন্তু সেসময় অন্যান্যদের কথা বলার কারণে তিনি সেই ভিক্ষুকের আওয়াজ শুনতে পান নি। কিছুক্ষণ পর তিনি(আ.) বাইরে এসে বললেন, কোন ভিক্ষুক সাহায্য চেয়েছিল, সে কোথায়। সবাই তখন তাকে খুঁজল, কিন্তু পেল না।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেই ভিক্ষুক নিজেই আবার আসলেন। তখন হযরত সাহেব তাকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন। এরপর তিনি অনুভব করলেন, যেন মাথা থেকে একটি ভারি বোঝার অপসারণ হয়েছে। তিনি বললেন, আমি দোয়াও করেছিলাম যেন আল্লাহ্ তালা এই ভিক্ষুককে ফিরিয়ে আনে। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮)

(২) কারী হাফেজ মুহাম্মদ শফী সাহেবের মা মাঈ হায়াত বিবি সাহেবা বর্ণনা করেন, তিনি(আ.) যখন প্রথমবার শিয়ালকোটে এসেছেন এবং এখানে চাকরী-জীবন কাটিয়েছেন, তখন যে বেতন তিনি পেতেন, তা তিনি সেই মহল্লার বিধবা ও অভাবীদের মাঝেই বিতরণ করে দিতেন। তাদেরকে কাপড় বানিয়ে দিতেন বা নগদ অর্থ দিতেন। বেতন থেকে শুধুমাত্র খাবার খরচটুকু রেখে দিতেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২৫)

দিয়ানতদারী ও সততা

(১) মিঞা আব্দুল্লাহ সানুরী(রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত সাহেব কাদিয়ানের উত্তর দিকে হাঁটতে বেরুলেন আমি এবং শেখ হামেদ আলী সাহেব সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে একটি ক্ষেতের পাশে বড়ই গাছ ছিল আর বড়ই ধরে ছিল। সেই গাছের একটি পাকা বড়ই রাস্তায় পড়ে ছিল। হাঁটার মাঝেই আমি সেটি উঠিয়ে খেতে লাগলাম। হযরত সাহেব বললেন, খেও না, বরং সেখানেই রেখে দাও। এর কোন না কোন মালিক অবশ্যই আছে। মিঞা সাহেব বর্ণনা করেন, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন বড়ই গাছের কোন বড়ই সেই জমির মালিকের অনুমতি ছাড়া খাই নি। কেননা, আমি যখনই কোন বড়ই গাছের দিকে তাকাতাম, তখনই আমার এই ঘটনা মনে হয়ে যেত। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪)

কু-ধারণা পরিহার কর

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) প্রায় সময়ই বলতেন, একজন বান্দার উচিত সর্বদা খোদা তা'লার ব্যাপারে সুধারণা রাখা। সকল ভ্রান্ত মতবাদের গোড়া হল আল্লাহ্ তালা সম্পর্কে কু-ধারণা। খোদা তালা বলেন, যালিকুম যান্নুকুম আল্লাযী যানানতুম বিরাব্বিকুম আরদা-কুম। অর্থাৎ হে অস্বীকারকারীগণ! তোমরা খোদা তা'লা সম্পর্কে যে কু-ধারণা করেছ, তা-ই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। তেমিনভাবে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আনা ইনদা যান্নি আব্দী বী অর্থাৎ খোদা তা'লা বলেন, আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেমন ধারণা করবে, আমি তার সাথে তেমনই আচরণ করব।" (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮৪)

সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া ও মমতা

(১) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল(রা.) সাহেব বর্ণনা করেন, একবার মিঁয়া সাহেব [অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.)] দালানের দজরা বন্ধ করে পাখি ধরছিলেন। হযরত সাহেব জুমআর নামাযের জন্য বের হবার সময় তাকে দেখে ফেললেন আর বললেন, মিয়া! ঘরের পাখি ধরতে হয় না; যার মাঝে দয়া-মায়া নেই তার মাঝে ঈমান নেই। (সীরাতুল মাহদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮)

(২) কাশ্মীর নিবাসী খাজা আব্দুর রহমান সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার একটি মোটা কুকুর হযরত মসীহ্ মাওদউ(আ.)-এর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তখন আমরা (ছোটরা) চিন্তা করলাম, দরজা বন্ধ করে আমরা এটিকে মারব। কিন্তু কুকুর যখন ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল তখন হযরত সাহেবও ঘটনা বুঝে গেলেন এবং আমাদের এই কাজে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, অতঃপর আমরা দরজা খুলে কুকুরটিকে ছেড়ে দিলাম। (সীরাতুল মাহদী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১)

(৩) ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব(রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত সাহেবকে কোন এক ছোট্ট বালক জিজ্ঞেস করল, তোতা পাখি কি হালাল? তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যদি খাওয়ার উদ্দেশ্যে তোতা পাখি শিকার করি, তাতে কোন সমস্যা আছি কিনা। হুযূর(আ.) বললেন, মিয়া! হালাল এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বল তো, সব প্রাণি কি খাওয়ার জন্যই হয়? অর্থাৎ খোদা তা'লা সব প্রাণি শুধুমাত্র খাবারের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি। বরং কোন কোন প্রাণিকে দেখার জন্য এবং জগতের সৌন্দর্যের জন্যও সৃষ্টি করেছেন। (সীরাতুল মাহদী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৫)

(চলবে)

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, খাকসারের বড় বোন রেশমা বেগম, স্বামী-মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল গত ০৪/০৭/২০১৭ ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৬.৩০ ঘটিকায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকায় ৪৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ২ ছেলে, ১ মেয়ে এবং ২ ভাই ও ২ বোন রেখে যান। পাক্ষিক **'আহমদী'** পত্রিকার মাধ্যমে জামা'তের সকল সদস্যের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি আল্লাহ্ তা'লা যেন খাকসারের বোনের রূহের মাগফেরাত করে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মকাম দান করেন, (আমীন)।

আফছার মোল্লা

ইসলাম: বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পথিকৃৎ

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

(১ম কিস্তি)

আজকের বিশ্ব যে সমস্যাগুলো মোকাবেলা করছে তা বহুমাত্রিক। এর ধরন-ধারন যেমন বিচিত্র তেমনই এর অনেক জটিল দিকও রয়েছে। বিভিন্ন আঙ্গিকে আর বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এসব সমস্যা নিরসনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পন্থাগুলোর একটি হতে পারে ধর্মের ভিত্তিতে। প্রকৃতপক্ষে, এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অবশ্যই এর উপর প্রচুর অধ্যয়ন করা আবশ্যক, আর এতে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সমস্যাগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এটি সুখকর ও সন্তুষ্টিজনক এক বিষয় হবে, যদি আমরা সকলে একসঙ্গে একত্রিত ও একমত হয়ে এই সমস্যাগুলো নিরসনে আমাদের চিন্তাভাবনাকে পরস্পরের সাথে শেয়ার করে, আমাদের নিজ নিজ ধর্মের ভিত্তিতে এই সমস্যাগুলো সমাধানের পথ খুঁজি, তবে আশা করা যায় তা খুঁজে পাওয়াটা খুব কঠিন হবে না।

ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সকলের কাছেই নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ ঐশীবাণীরূপে স্বীকৃত ও সুবিদিত, তাই মানুষের কার্যকলাপের বিভিন্ন দিকগুলো ঐশী মর্যাদার উচ্চমান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হলে বিশ্ব বহুবিধ সমস্যার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। ধর্মভিত্তিক জাতি-গোষ্ঠি বিবেচনায় সমকালীন বিশ্বের প্রায় সবাই অবশ্যই এর কোন না কোন একটির আওতাভুক্ত। এসব সমস্যাগুলোর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিয়ে মূল্যায়ন করা হলে, আর একে অপরের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে সহমর্মীতার নীতি ও শিক্ষার আলোকে উদ্দীপ্ত আদর্শের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে বিশ্ব-নের্তৃবৃন্দ সহসাই তাবৎ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন, নিশ্চিতভাবেই এটা বলা যায়।

বিশ্বাসগত দিক থেকে যে নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ইসলাম পরিপূর্ণতার দাবী করে, তা হলো জাতি,বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সুন্দর সাবলীল জীবনপথের সমস্ত মৌলিক বিধান সম্বলিত মহান নির্দেশিকা- আল্ কুরআন। কারণ, এতে বর্ণিত শিক্ষামালা অন্য কোন সোর্স থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা নয়, বরং বিশ্বজগতের স্রষ্টা স্বয়ং নিজ করুণায় মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য স্বীয়-বাণী পূর্ণাকারে ফিরিশতা জিবরাইলের মুখে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠিয়েছেন, যদিও ইতিপূর্বে তিনি খণ্ডিতাকারে বা আংশিকভাবে বিভিন্ন নবীগণকেও অনুরূপ বাণী পাঠিয়েছিলেন।

ইসলামে রয়েছে এক সার্বজনীন বার্তা:

অধুনা উদ্ভূত সমস্যাগুলোর গভীরে অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কে অনেকেই এই সত্যটি বুঝে উঠতে পারে না যে, আমরা যে জগতে বাস করছি তা দ্রুততার সাথে উন্নততর এক মাত্রায় একাকার হয়ে যাচ্ছে।

মানবজাতি এখন, একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সাথে বসবাস করা সময়ের দাবী। অন্য কথায়, তাদের মাঝে সত্যিকারেই ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা সমুন্নত রাখা এখন বাস্তবে প্রকাশমান এক সত্য। এজন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে অনেক কিছুরই সমন্বয় সাধন করা শিখতে হবে। এহেন অবস্থায় চোখ-কান বুঁজে থাকা আত্মহত্যারই নামান্তর। অতএব, এ যুগে কূপমণ্ডুকতার কোন ঠাঁই থাকতে পারেনা।

তাই আজ, মানুষের চাহিদা পূরণ করতে হলে চাই এমন একটি বিশ্বাসপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, যা রাষ্ট্রীয় উপজাতীয়, জাতীয়, জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক সীমা অতিক্রম করে সর্বজনীনতার স্তরে মানুষের অধিকার ও বিকাশমান ক্রমোন্নতিধারা নিশ্চিত করবে।

ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, কুরআন শরীফের সূচনাতেই রয়েছে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۲﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ, সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালকের জন্য। (১:২)

এই আয়াত সামগ্রিকভাবে এক মানবতা আর একই মহাবিশ্বের ধারণা উপস্থাপন করে গোটা মানবজাতিকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। ইসলামের বার্তা মানবজাতির কোন অংশের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সমগ্র মানবজাতিকে এবং সমগ্র বিশ্ব-জগতকে ধারণ করে রয়েছে। অনুরূপভাবে, মহান গ্রন্থ আল্-কুরআনে আরো রয়েছে–

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

অর্থাৎ- তুমি বল,'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য আকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর (প্রেরীত) রসূল। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুও দেন। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল এ উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহতে ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখে, এবং তোমরা তাকে অনুসরণ কর যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ কর।' (৭:১৫৯)

মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে:

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

অর্থাৎ- আর আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমতরূপেই পাঠিয়েছি । (২১:১০৮)

ইসলাম মানুষের মাঝে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

অর্থাৎ- আর তোমরা সবাই 'আল্লাহর রজ্জু' দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। আর আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তখন তিনি তোমাদের হৃদয় প্রীতির বাঁধনে বেধে দিলেন এবং তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে, তিনি তা থেকে রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণণা করেন, যেন তোমরা হেদায়াত লাভ কর। (৩:১০৪)

আজ, মানুষ আবারও ধ্বংসের অতল এক গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই যুগের জন্যও তিনি পথনির্দেশ দান করেছেন, আর তাঁর সেই আদেশের ব্যাখ্যা দিয়ে জানিয়েও দিয়েছেন যে, মানবজাতি কি করে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে?

ইসলাম মানুষের গায়ের রঙ, জাতি, ভাষা ইত্যাদি বৈচিত্রময়তাকে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযোগী ও উপকারী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে । পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿۲۳﴾

অর্থাৎ- আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মাঝে রয়েছে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও রঙের বিভিন্নতা। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (৩০:২৩)

কিন্তু, এ ঘোষণা এক চেটিয়াভাবে কাউকেই বিশেষ কোন অগ্রাধিকার প্রদান করে না, কেননা কারো সত্যিকারের সম্মান নির্ভর করে শুধুমাত্র তার নিজ-জীবনে প্রতিপালিত পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর।

যেমন. পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۴﴾

অর্থাৎ- হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং আমি তোমাদেরকে গোষ্ঠী ও উপজাতি বানিয়েছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে (সে-ই) সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি, আল্লাহর দৃষ্টিতে যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎকর্মশীল, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৪৯:১৪)

বর্ণ, জাতি বা গোষ্ঠি সম্পর্কিত বা পরিবার, পদ, সম্পদ থেকে প্রাপ্ত পার্থক্যসূচক কোন বিশেষাধিকার যদি দৃষ্টিগোচর হয়ও, তবে এ ঘোষণা দ্বারা তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ ঘোষিত এ নীতিমালা দ্বারা ইসলাম সমগ্র মানবজাতিতে এক মহান ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরুক রেখে আমাদের সবার মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে, এবং সৎকর্ম সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদেরকে পরস্পরের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করার শিক্ষা দেয়।

সুতরাং, ইসলাম মৌলিক একত্বের উপর ভিত্তি করে নিজেকে উপস্থাপন করায় স্রষ্টার একত্ব, মহাবিশ্বের সুশৃংখলা, মানুষের ঐক্য এবং জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে এক সামগ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুৎসই ও টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো ইসলামের উদ্দেশ্য, যাতে মানব-কার্যকলাপের সকল দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এমন একটি ভারসাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থায়িত্বের মানে যা হবে কালোত্তীর্ণ আর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দুয়ার থাকবে অবারিত। (চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৭২)

(৩) বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার বন্ধের আহ্বান

ইমাম মাহদী (অর্থঃ সৎপথপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক নেতা) এবং 'মসীহ মাওউদ' (অর্থঃ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ বা ওয়াদাকৃত ঈসা) হওয়ার দাবীঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতার প্রকৃত দাবী কি তা ভালভাবে না জানার কারণেই নানা প্রকার বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার করা হয়ে থাকে। তাই বিষয়টি সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আ.)-এর ৮৮ খানা পুস্তকের মধ্য থেকে দৃষ্টান্তমূলক কয়েকটি উদ্ধৃতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(ক) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী 'মুজাদ্দিদ' এবং 'মসীহ' ও 'মাহদী' হওয়ার দাবী সম্পর্কে হযরত আহমদ (আ.) বলেনঃ

* "হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর উপর মুসলিম উম্মতের ওলী, দরবেশ ও আলেমগণের দৃষ্টি যে নিবদ্ধ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কাশফ (দিব্য-দৃষ্টি), রুইয়া (সত্য-স্বপ্ন) ও ইলহামের (ঐশী-বাণী) ইঙ্গিত এই যে, হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে সেই বিরাট প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আসিবেন, যাকে হাদীসের গ্রন্থসমূহে মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) উপাধি দেওয়া হইয়াছে। 'ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহ্দী নাই'– হাদীস ইবনে মাজা। (যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনিও নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ডাকে সাড়া দিবার লোক অল্পই দেখা গিয়াছে)। ফল কথা, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় যে একজন মুজাদ্দিদ আসেন, একথা নূতন নহে বা লোকের অজানা নহে। আল্লাহতা'লার এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বর্তমান শতাব্দীতেও মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক ছিল। অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইয়া এখন উনিশ (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ৩৮ বৎসর চলিতেছে –প্রকাশক) বৎসর চলিয়া গিয়াছে।" (তবলীগে হক পুস্তক, পৃ. ৭)

* "প্রশ্ন এটাই বাকী আছে যে, বর্তমান যামানার ইমাম কে, যার অনুসরণ করা সকল মুসলমানের, সকল খোদাভীরুর, সত্য স্বপ্নদ্রষ্টাগণের এবং ইলহাম বা ঐশীবাণী প্রাপ্তগণের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবে আমি দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করছি যে, খোদার ফযলে এবং ইচ্ছায় সেই যুগ-ইমাম আমি। এজন্য যাবতীয় নিদর্শন ও শর্তাদি খোদা তা'লা আমার মধ্যে সমাবিষ্ট করেছেন এবং আমাকে শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত করেছেন। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)–এর আবির্ভাব সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল। এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের অন্ত ছিল না। পরস্পর বিরোধী এইরূপ মত ও উক্তিগুলোর মীমাংসা করার জন্য একজন হাকাম বা বিচারকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল আর সেই বিচারক আমি।" (জরুরতুল ইমাম)

(খ) 'আমাকে প্রত্যাখান করা সম্ভব নয়':

হযরত আহমদ (আ.) বলেন:

* "আমার দাবী যদি আমার নিজের পক্ষ থেকে হতো, তাহলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করার কোনও দায়-দায়িত্ব তোমাদের থাকতো না। কিন্তু, যদি খোদা তা'লার পবিত্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মাধ্যমে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করে থাকেন এবং আমার সমর্থনে খোদা তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে নিজেদের অনিষ্ট করো না। একথা বল না যে, মুসলমান মসীহকে মানবার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই।" (আইয়ামুস সোলাহ্)।

* "যেহেতু আমি প্রতিশ্রুত মসীহ এবং খোদা আমার সমর্থনে বহু ঐশী নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, সেহেতু প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসাবে আমার আগমন সম্পর্কে যে ব্যক্তিকে খোদার দৃষ্টিতে যথেষ্ট সতর্ক করা হয়েছে এবং যে আমার দাবী অবহিত তাকে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কেননা খোদা-প্রেরিত ব্যক্তিগণকে স্বীকার করা ছাড়া কারও নিস্তার নেই। তিনি যাঁর পক্ষে ও যাঁর সমর্থনে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে– তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। যে ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করে না, সে আমাকে অমান্য করে না বরং সে অমান্য করে তাঁকেই যিনি আমার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।" (হাকীকাতুল ওহী)।

(গ) পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 'বুরুজী' রঙে (অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে) মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পূনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছেঃ

* 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' বা সত্যের পূর্ণ প্রচার সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। আঁ-হযরত (সা.)-এর উপর ইসলাম ধর্ম পূর্ণ হইয়াছিল এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও তাঁহার উপর পূর্ণ হইয়াছিল। ধর্মের এই পূর্ণতা ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের এই পূর্ণ বিকাশের দুইটি অংশ আছে। প্রথম অংশের নাম 'তকমীলে হেদায়াত' বা ধর্মের বিধি–ব্যবস্থার পূর্ণতা। দ্বিতীয় অংশের নাম 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' বা ধর্মের পূর্ণ প্রচার। 'তকমীলে হেদায়াত' বা বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রথম আগমনে সর্বতোভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' তাঁহার দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণ হইবে। পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর যে আয়াতে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম' আসিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, আঁ হযরত (সা.)-এর আত্মিক প্রভাবে আর একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, 'বুরুজী রঙে' আঁ হযরত (সা.) আবার আসিবেন। অর্থাৎ তাঁহার আত্মিক শক্তি অন্য কোন মহাপুরুষের মধ্যে দেখা যাইবে। এখন এইরূপই হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান যুগই সত্যের পূর্ণ প্রচারের যুগ। ইহার একটি লক্ষণ এই যে, প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণ হইয়াছে। ছাপাখানা, ডাক ও টেলিগ্রামের ব্যবস্থা, রেলগাড়ী, জাহাজ এবং সংবাদপত্র আজ সমস্ত পৃথিবীকে একটি শহরের মত করিয়া দিয়াছে। এই সমুদয়ের উন্নতিতে বস্তুতঃ আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পূর্ণ প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। হযরত ঈসা (আ.) বলিয়াছিলেন, 'আমি তওরাত পূর্ণ করিতে আসিয়াছি'। তদ্রুপ আমি বলিতেছি, 'ইসলামের পূর্ণ প্রচার আমার অন্যতম কাজ'।" (তবলীগে হক পুস্তক)।

* "এই উম্মতের জন্য যে আগমনকারী 'মসীহ'-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে সে হবে এই উম্মতের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি। বোখারী ও মুসলিমের সেই যে হাদীস, যাতে 'ইমামাকুম মিনকুম' এবং 'ইম্মাকুম মিনকুম' লিখিত আছে, তার অর্থ হচ্ছে, সে তোমাদের ইমাম হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকেই হবে। যেহেতু, এই হাদীস হচ্ছে আগমনকারী ঈসার (আ.) জন্যে এবং এই হাদীসে 'হাকাম' ও 'আদাল' শব্দ গুণবাচক শব্দ হিসেবে বিদ্যমান আছে, যা এই কথার পূর্বেই বলা হয়েছে, সেহেতু 'ইমাম' শব্দটি তারই জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে মিনকুম' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছিল সাহাবাদেরকে। বস্তুতঃ তাঁরাই ছিলেন সম্বোধিত। কিন্তু এটাও সবারই জানা কথা যে, তাঁদের মধ্য থেকে কেউই প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করেননি। কাজেই, এখানে 'মিনকুম' শব্দ এমন কোনও এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে যে খোদাতায়ালার জ্ঞানে সাহাবার 'কায়েম মোকাম' এবং সে হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে নিম্নোক্ত আয়াতে কায়েম মোকাম সাহাবা করা হয়েছে অর্থাৎ 'ওয়া আখরিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকোবেহিম' আয়াতে (সূরা জুমা')। কেননা, এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি রসূলের (সা.) রূহানিয়াত দ্বারা তরবিয়তপ্রাপ্ত হবে এবং এই অর্থে সে সাহাবাদের ভিতরে আছে। এই আয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যার হাদীস হচ্ছে– 'লাও কানাল ইমানো মুয়ালাকা বেস সুরাইয়া লানালাহু রাজুলাম মেন ফারেছ' এবং এই ফারসী (পারশ্যবাসী) ব্যক্তির প্রতি সেই গুণই আরোপিত করা হয়েছে যা কিনা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর জন্য খাসভাবে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ এই পৃথিবী, যা ইমান ও তৌহিদশূন্য হয়ে জুলুম (পাপ ও অন্যায়-অনাচার) দ্বারা ভরে গেছে, তাকে পুনরায় তার আদেল' (ন্যায় ও ইনসাফ) দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে। অতএব, সেই ব্যক্তিই হবে মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ, এবং আমিই সেই ব্যক্তি। অন্য কোনও মাহদীয়াতের দাবীদারের সময়ে যেমন রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয় নি, তেমনি বিগত তেরশত বছরের মধ্যে কেউ খোদাতায়ালার ইলহামের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে এই দাবীও করেনি যে, 'লানালাহু রা'জুলুম মিন ফারেস' –এই ভবিষ্যদ্বাণী যার উদ্দেশ্য, সে আমি।" (তোহফায়ে গোলড়বিয়া, পৃ. ২৭-২৮)।

(চলবে)

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

৮ম কিস্তি

আমাদের জামেয়ার বুযুর্গ শিক্ষকগণ

হযরত সৈয়্যদ মীর দাউদ আহমদ সাহেব ছিলেন প্রিন্সিপাল। প্রত্যেক ছাত্রকে তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গেলে লেখা অনেক বড় হয়ে যাবে। তাই দু একটি কথা লিখছি।

অনেক সময় মাগরিবের নামায আমি মসজিদ মোবারকে পড়তাম। আরো অনেকেই পড়তেন। খুব দ্রুত পায়ে হাঁটলে জামেয়া থেকে মসজিদ মোবারক যেতে প্রায় ১৫ মিনিট লাগত। ১৯৭০-৭১ সনের কথা বলছি। মাগরীবের পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) অনেক সময় মসজিদে অনানুষ্ঠানিকভাবে বসতেন, কথাবার্তা বলতেন, যা রেকর্ড করা হত না। অনেক সময় আমরা ১৫/২০ জন বসতাম। জামেয়ার ছুটিতে আরো বেশি বাজামাত নামায মসজিদ মোবারকে পড়তাম। অনেক সময় আযানও দিয়েছি। একবার এমন হয়, প্রতিদিন ফজরের নামাযে মসজিদ মোবারক যাওয়া শুরু করলাম। এমনকি ঝড়-বৃষ্টির দিনেও গিয়েছি।

আমাদের প্রিফেক্ট একদিন মুবাশ্বের আহমদ কাহলুনকে (বর্তমানে তিনি বড় আলেম, মুফতী সিলসিলাহ) বললেন, ইমদাদুর রহমানকে নিষেধ কর। প্রতিদিন মসজিদ মোবারকে বেশি বেশি নামাযে যাওয়া বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এ কথাটি সাধারণ পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হতে পারে। ঘটনা এই যে, ইসলাম মধ্যম পন্থার কথা বলে। কোন বিষয়ে অনেক বেশি বাড়াবাড়ি হলে পরবর্তীতে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে এখানে বেশি কিছু লিখতে চাই না।

একবার হযরত মীর সাহেব আমাকে সাথে নিয়ে পাখি শিকারে গিয়েছিলেন। বছরে একবার পিকনিক হত কোন নহরের (পানির বড় বড় খাল, ছোট নদীর মত) পাড়ে। সাঁতার কাটতে হত। বিনোদন মূলক বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান হত। হযরত মীর সাহেব সকল ছাত্রকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখতেন। কোন কোন সময় ছাত্রকে এরকম শাস্তি দেয়া হত, যেমন এত ওয়াক্তের নামায মসজিদে মোবারকে পড়তে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন শত শত মোবাল্লেগ আছেন; যারা হযরত মীর সাহেবকে স্মরণ রাখেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন।

হযরত সৈয়্যদ মীর দাউদ আহমদ সাহেব ১৯৭৩ সালে ইন্তেকাল করেন। মোহতরম মালেক সাইফুর রহমান সাহেব মুফতি সিলসিলাহ আহমদীয়া, জামেয়ার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হলেন। অত্যন্ত পবিত্র হৃদয়, পরিচ্ছন্ন স্বভাবের বুযূর্গ ছিলেন। আহমদী হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি আলেম ছিলেন। আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম, লাহোর নামক আহমদী বিরোধী সংগঠনের তিনি এক সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

তিনি যখন শিক্ষানবিশ ছিলেন, তখন স্কুল-কলেজ ছিল না, তাই কোন মৌলভী সাহেবের ছাত্র হিসেবে তার মসজিদে বা মাদ্রাসায় পড়তে হত। আমাদের মালেক সাহেবের সাথে আরো ছাত্ররা পড়ত। তখন দোয়াত-কলমের ব্যবহার হত। দোয়াত-কলম সাথে সাথে রাখতে হত। একদিন এক ছেলে তার দোয়াতের কালি মালেক সাহেবের জামার উপর ফেলে দিল। মালেক সাহেব এতে এত কষ্ট পেলেন যে, তিনি ঐ মাদ্রাসা ছেড়ে চলে আসলেন।

সম্ভবত তখন আমরা দরজা উলার ছাত্র। আমাদের সাথে খুবই মেধাবী কিন্তু ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির একজন ছাত্র ছিল। সব সময় দুষ্টামি করত। একদিন মোহতরম মালেক সাহেব আমাদেরকে পড়াচ্ছিলেন। ঐ দুষ্ট ছেলেটি পেছন থেকে জানালা দিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়লো অর্থাৎ ওস্তাদকে না জানিয়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে মোহতরম মালেক সাহেব তার খোঁজ করলেন। পাশের ছিটের ছাত্র জানাল, সে তো এভাবে পালিয়েছে। হয়ত আপনারা বিশ্বাস করবেন না, মোহতরম মালেক সাহেব তার পালানোর কথা শুনে এত কষ্ট পেলেন যে, তিনি কোন কথা না বলে ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন। পরে জানতে পারলাম, তিনি জামেয়া ছেড়ে বাড়ী চলে গেছেন। বিকেলে খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা কয়েকজন তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। আসলেই তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) অনেক উঁচু

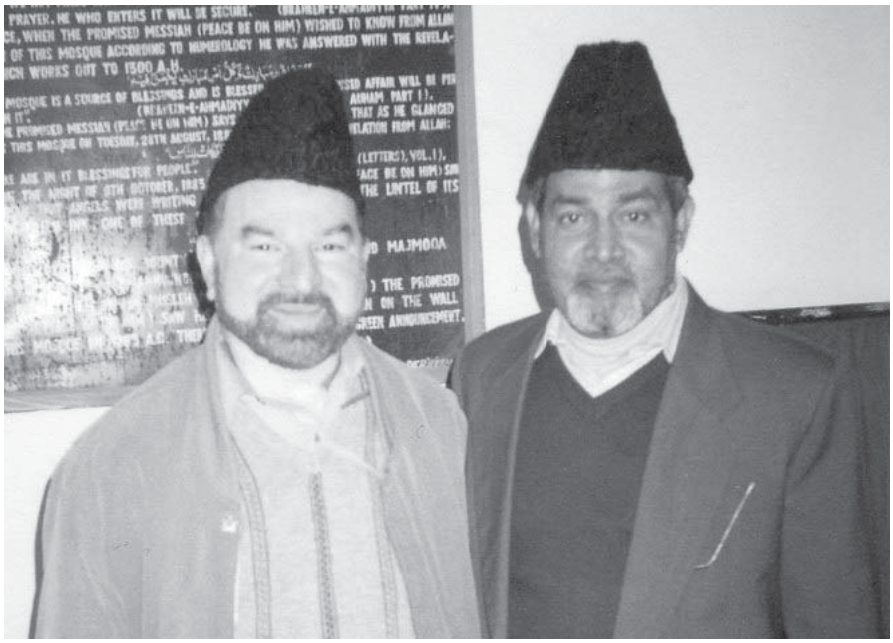

মাগফুর মুনিব মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্‌র সাথে লেখক

মর্যাদার যুগ-ইমাম, অত্যন্ত দূরদর্শী মহান নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। ১৯৪৭ সনে হিন্দুস্থান স্বাধীন হলে পাকিস্তান নামক মুসলিম দেশটির জন্ম হয়। হিন্দুস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হিজরত করে পাকিস্তানে চলে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুসলমান ধনসম্পদ, বাড়িঘর ফেলে আসে। সেসময় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যেভাবে আহমদীদেরকে নিরাপদে হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানে নিয়ে আসেন, বিশেষ করে আহমদীয়াতের মরকয কাদিয়ান থেকে সকলকে নিয়ে আসেন, সেটি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কিন্তু এখানে মোহতরম মালেক সাইফুর রহমান সাহেব প্রসঙ্গে যা বলতে চাচ্ছি তা এই যে, তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন, আহমদী আলেমগণের একটি দলকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) অনেক আগেই পাকিস্তান পাঠিয়েছিলেন। হুযুর (রা.) বলেছিলেন, আমরা কয়জন বা কে কে পাকিস্তান আসতে পারব জানা নাই। আপনাদেরকে পাঠাচ্ছি এ জন্য যে, আমরা যদি সহীহ সালামতে পাকিস্তান না-ও যেতে পারি, আপনারা আহমদীয়াতকে হেফাজতের সাথে কায়েম রাখতে পারবেন। অর্থাৎ যুগ ইমামের সাথে বড় বড় বুযূর্গ রুহানী উচ্চতা সম্পন্ন আলেমগণ একান্তই আবশ্যক। ঐ দলে মোহতরম মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের সাথে মৌলভী মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব লাইব্রেরীয়ানও [খেলাফত লাইব্রেরী রাবওয়া] ছিলেন।

মোহতরম মালেক সাহেব অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, নির্মল, পবিত্র আর খুবই নরম অন্তরের মানুষ ছিলেন। আল্লাহর রহমতে তিনি বড় বুযূর্গ, পূণ্যবান ছিলেন। আমাদেরকে তিনি খুব ভালোবাসতেন।

আমি যখন জামেয়া পাশ করে বেরিয়েছি এবং মুরুব্বী হিসেবে কর্মরত হয়েছি, একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমার বিয়ের জন্য তাঁর কাছে খুব ভাল মেয়ের প্রস্তাব আছে; আমি হুযুর (আই.)-এর খেদমতে হাজির হলাম। হুযুর বললেন, না তোমাকে তো বিয়ে করতে বাংলাদেশে যেতে হবে। আমি আবার মোহতরম মালেক সাহেবের কথা বললাম। হুযুর বললেন, না, তোমাকে বাংলাদেশে বিয়ে করতে হবে, সুবহানাল্লাহ।

আমি মৌলভী মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেবকেও খুব ভাল চিনি। তাঁর সাথে অনেক নিকট সম্পর্ক ছিল। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এমন বুযূর্গ আলেমগণের কাছে তা'লীম-তরবীয়ত পেয়েছি।

আমার মনে হয়, হাজার হাজার আলেমের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই বর্তমানে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বিভিন্ন দেশে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।

হযরত মালেক সাইফুর রহমান সাহেব কিভাবে আমাদের তা'লীম ও তরবীয়ত দিয়েছেন, তার দুটি ঘটনা বলছি, বেশি বলার সুযোগ নাই।

আমি রাবওয়া গোলবাজারের মধ্য দিয়ে জামেয়ার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। মোহতরম মালেক সাহেব সাইকেলে করে খেলাফত লাইব্রেরীর দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ দেখি মালেক সাহেব সাইকেল থেকে নেমে আমার দিকে আসছেন। কাছে এসে বললেন, 'একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, বিশেষভাবে দোয়া করবেন।' তারপর তিনি আবার সাইকেলে করে চলে গেলেন। আমি তাঁর যাবার পর কেঁদে ফেলেছি। আমি একজন অতি সাধারণ ছাত্র, আমার তো কোন অবস্থা নাই। মালেক সাহেবের মত মানুষ আমাকে দোয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। আমরাই তো তাঁর কাছে দোয়া চাইব, তিনি দোয়া করবেন, অথচ তিনি দোয়া চাইছেন।

প্রথম থেকে তিনি আমাদেরকে আরবী গ্রামার পড়াতেন। তখন আমরা দরজা সালেসার ছাত্র। একবার তিনি তাঁর জীবনী শোনাতে আরম্ভ করলেন। কথার মধ্য থেকে কিভাবে এমন কথা উঠল যে, কিছুদিন পর লাহোরে প্রতি বছরের মত মেলা শুরু হবে। সম্ভবত মেলার নাম ছিল 'হর্স এন্ড কেটল শো'। সেখানে বহু রকম পশুর খেলা দেখানো হত। মানুষ বডি-বিল্ডারদেরকে দেখানো হত। সম্ভবত তিনদিন বা সাত দিন চলত, স্মরণ নাই। মালেক সাহেব বললেন, কেউ যদি ঐ মেলায় যেতে চায়, তাহলে তিনি তাকে তার খরচে মেলায় পাঠাবেন। আমি সর্বাগ্রে বলে উঠলাম, আমি যেতে চাই। অতএব আমার যাবার বিষয়টির অনুমোদন হয়ে গেল। পরের দিন বললাম, আমি একা গেলে তো মজা হবে না, একজন সঙ্গী দরকার। তিনি বললেন, ঠিক আছে কাকে নিবেন? আমি বললাম, মাগফুর আহমদ মুনীব আমার ভাল বন্ধু, তাকে নিতে চাই। মাগফুর মুনীর সাহেব জাপানে ১৬ বছর মোবাল্লেগ ছিলেন, এর মধ্যে ১০ বছর মোবাল্লেগ ইনচার্জ। এখন রাবওয়াতে জাপানী ডেস্কের ইন্‌চার্জ। (চলবে)

জনকের প্রতি এক আত্মজের বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ

সুলতান আহমদ, বেলজিয়াম
মরহুমের বড় ছেলে

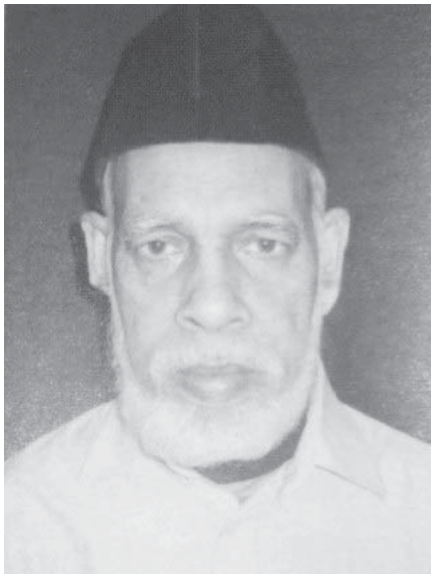

মহান আল্লাহ্ তা'লা শিখিয়েছেন–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌রই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'। এই আমোঘ সত্যকে মানার পরও কোন কোন প্রত্যাবর্তন মেনে নেয়া খুবই কষ্টের। কেননা, এত প্রিয় কোন আপনজন হারানোর বেদনা যে এর আগে আমি কখনোই অনুভব করিনি।

আমার আব্বা যার হাত ধরে আমি হাটতে শিখেছি, যার হাত ধরে আমি লিখতে শিখেছি, যার দোয়া, দিকনির্দেশনা আর ভালোবাসাময় ছায়ায় আমার জীবনের এতগুলো বছরের অনেক ঝড়-ঝাপটা পার হয়ে এসেছি, সেই আব্বা চলে গেছেন "না ফেরার দেশে"।

আব্বাকে হারানোর খবর শোনার পর থেকেই পৃথিবীটা কেমন যেন থমকে গিয়েছে। আব্বার সাথে অনেক পুরনো স্মৃতিগুলোও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে আসছে। ছোট বেলার কোন কোন ঘটনা যা এর আগে হয়তো কখনো মনেই পড়ে নি বা হয়ত মনে পড়ার মতো কোন প্রয়োজনও হয় নি, আজ সেগুলোও মনের কোনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে। ৩০/৩৫ বছর আগের ঘটনাও মনে হচ্ছে এইতো সেদিনের কথা। গাছে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছি- আব্বা এসে পরম মমতায় কোলে তুলে নিলেন, আমি পড়ে গিয়ে ভয় পেয়ে কাঁদছি কিন্তু আব্বার মুখে হাসি, বললেন "পাগল ছেলে এত নিচু ডাল থেকে পড়ে গিয়ে কাঁদতে হয়?"

আব্বা শিক্ষক ছিলেন, হাসিমুখে শেখাতেন, আদর করে শেখাতেন, ভালবাসা দিয়ে শেখাতেন, সাহস দিতেন অসম্ভবকে সম্ভব করার। কতটুকু পেরেছি জানি না, কিন্তু আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক তিনিই।

ছোট বেলার কথা, আমি সাঁতার জানি না। আব্বা আমাকে সাঁতার শেখানোর জন্য পুকুরে নিয়ে গেলেন। আমি ভয়ে আব্বাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছি। আব্বা বললেন, "ভয় নেই ছেড়ে দাও, আমি আছি না"। আমি ছেড়ে দিলাম, আব্বা আমার পেটের নিচে দু'হাত দিয়ে আমাকে আগলে রাখলেন যেন ডুবে না যাই। আমি আমার সমস্ত ভার আব্বার হাতের ওপর ছেড়ে দিয়েছি, মনের আনন্দে নির্ভয়ে সাঁতার কেটেছি। আর এতগুলো বছর সেই একই নির্ভাবনায় কাঁটিয়েছি। সব সময় মনে হতো- আমার ভয় কি, আব্বার হাত তো আমাকে আগলে রেখেছে।

জীবনের এতগুলো বছর পাড়ি দিয়েছি সেই ভরসায়। কারন আমি জানতাম, যত বড় পরিক্ষাই আসুক আব্বার দোয়া আর তাঁর ভালোবাসাময় হাত দু'টো আমাকে আগলে রাখবে।

অথচ সেই হাত দুটো ধরে কখনোই বলা হয় নি, "আব্বা আপনি যদি কখনো আল্লাহর কাছে চলে যান, আমি আপনাকে অনেক মিস করবো"। এটি বলা হয়নি বললে ভুল বলা হবে, আমি তো আসলে এই কথা কখনো বলতেই চাইনি, কারন আব্বাকে আমি কখনোই হারাতে চাইনি। কিন্তু চোখ দু'টো মানছে না, অব্যক্ত কথাটা অব্যক্তই রয়ে যাবার অপরাধে বাঁধ ভাংগা অশ্রু যেন আমাকেই দায়ী করছে।

আমার জীবনের সবচেয়ে আদর্শবান, সহজ সরল ধার্মিক মানুষটি নিয়মিত খুব ভোরে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তিনি জীবনে এমন অনেক কুরবানী করেছেন, যার সবটুকু অনেকেই, এমনকি আমরা তার সন্তানরাও হয়তো জানি না। তবে আমি যতটুকু জানি, তিনি আল্লাহ, তাঁর রসূল (সা.) আর যুগের ইমাম মাহদীকে (আ.) ভালোবেসে অসাধারণ কুরবানীর সাক্ষর রেখে গেছেন তার সন্তান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

আমার আব্বা মোকাররম মাস্টার আবু বকর আকন্দ সাহেব ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে টাঙ্গাইল জেলার চাঁনতারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালে তিনি ইসলাম-আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি আমাদের গ্রামের চাঁনতারা হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বয়আত গ্রহণের পূর্বে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে একবার স্বপ্নে দেখেন। এরপর, এক আহমদী পরিবারের বাসায় বেড়াতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ছবির এই মানুষটি কে? তাঁকে বলা হল এই ছবিটি হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর। আব্বা বলেন, আমিতো এনাকেই আমার স্বপ্নে দেখেছি। এরপর তিনি ঢাকাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন। আহমদীয়াত সম্পর্কে বিস্তর পড়াশোনা করে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন এবং চাঁনতারাতে

জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন চাঁনতারা জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং দোয়ায় আল্লাহর ফজলে প্রায় এক শত মানুষ বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি ও অন্যান্য আহমদীরা চাঁনতারাতে অনেক মোখালেফাতের সম্মুখীন হয়েছেন। আহমদী বিরোধীরা তাঁকে হত্যা করার হুমকিও দেয় সে সময়। এই দুই বছর তিনি বেশীরভাগ সময় নিজ বাসা, পরিবার তথা গ্রামের বাইরে থেকেছেন। হারিয়েছেন তার হাতে গড়া স্কুল আর পেশাগত অবস্থান। এই দু'টো বছর আমরা তিন ভাই খুব কমই আব্বাকে কাছে পেয়েছি।

আমার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। একদিন বিকেলে কিছু ধর্মান্ধ, স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের বাড়িতে আসে বিপুল পরিমান কাঁটাওয়ালা গাছ নিয়ে। আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই ঘরে তালা দিয়ে সেই কাঁটাওয়ালা গাছগুলো আমাদের ঘরের দরজায় ও চারপাশে বিছিয়ে দেয়। কি নির্মম পরিহাস! যে নবী (সা.)-এর রাস্তায় কাফেররা কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, অথচ সেই নবীর (সা.) তথাকথিত অনুসারীরা, সেদিন আমাদের ঘরের দরজায় কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে, ভেবে দেখার বিষয়-তারা কি মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করেছে নাকি কাফেরদের? নবীর (সা.) রাস্তায় কাঁটা বিছাতো যে বুড়ি, তাকে মহানবী (সা.) মাফ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নামে, সেদিন যারা আমাদের ঘরের দরজায় কাঁটা বিছিয়েছিল তিনি (সা.) কি তাদেরকে মাফ করবেন? এদের জন্যই কি মহানবী (সা.) বলেছেন যে, তাঁর তথাকথিত কিছু অনুসারীকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে? আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন।

সেই ইমাম সাহেব, যেদিন আমাদের ঘরের দরজায় কাঁটা দিয়া যান, সেদিনই আমার আম্মা আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে রাতের আধারে নানা বাড়ী পালিয়ে যান। আর এভাবেই মহানবী (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের অনুসরনে আরও ছোট্ট একটি অধ্যায় রচিত হয়েছিল।

সেদিন তারা আমাদের ঘরের দরজায় কাঁটা দিয়ে আমাদের ঘরে আমাদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে চেয়েছিল, আজ আল্লাহ্ তা'লা সারা দুনিয়ার দরজা আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন।

আমার আব্বা ছিলেন বাংলাদেশের 'আসিরানে রাহে-মাওলাদের একজন'। সে সময় বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে তিনি প্রশাসনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, স্থানীয় আহমদী ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য, তিনি থানায় মামলা করেন, কিন্তু আহমদী বিরোধীরা এত বেশী শক্তিশালী ছিল যে, আহমদীদের নিরাপত্তা দেয়ার বদলে তাঁকে সহ আরো ৪ জন আহমদীকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তাঁকে কয়েকমাস যাবত কারাগারে আহমদীয়াতের কারণে বন্দী করে রাখা হয়।

এরপর কারাগার থেকে মুক্ত হবার পর ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের প্রয়াত ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোস্তফা আলী সাহেব তাঁকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় জামা'তের 'একাউন্টেন্ট' হিসেবে চাকরিতে নিয়োগ দেন। এরপর থেকেই তার সাথে আমরা অর্থাৎ আমার আম্মা এবং আমরা তিন ভাই ঢাকায় বসবাস করছিলাম। তিনি ছিলেন একজন দাঈ-ইলাল্লাহ; যেখানেই সুযোগ পেতেন তবলীগ করতেন।

১৯৯২ সালে, উগ্র আহমদী-বিরোধীরা ঢাকার বকশীবাজারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কেন্দ্র আক্রমণ করে। আব্বা যখন দেখেন লাঠি-সোঠা নিয়ে অনেক মানুষ গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে (যাদের বেশিরভাগই অল্প বয়সী মাদ্রাসার ছাত্র), তিনি দৌড়ে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অফিসে যান, আমীর সাহেবকে বলেন- "আমির সাহেব আমাদের মসজিদে আহমদী বিরোধীরা হামলা করেছে"। সে সময় আমার আরও একজন প্রিয় মানুষ মরহুম মুতিউর রহমান সাহেবের বাসা ছিল আমীর সাহেবের অফিসের ঠিক পিছনে। আব্বা আমীর সাহেবকে মরহুম মুতিউর রহমান সাহেবের বাসায় রেখে আবার আমীর সাহেবের অফিসে আসেন, অফিসের দরজা বন্ধ করতে। কিন্তু ততক্ষণে হামলাকারীরা আমীর সাহেবের আফিসে পৌঁছে গেছে এবং আব্বাকেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর ভেবে, লাঠি-শোটা দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলে যায়, যার ফলে তাঁকে বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকেই আব্বার শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তা খারাপের দিকে যেতে থাকে। এরপর পুরোপুরি শারিরিক সুস্থতা আব্বা কখনোই ফিরে পান নি।

গত ২৩ অক্টোবর ২০১৭ সকাল ১০.১৫ মিনিটে তিনি নিজ গৃহে ৬৯ বছর বয়সে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। মরহুম একজন মুসী ছিলেন; তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন পুত্রবধু এবং চার জন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মোকাররম মাহমুদ আহমদ বর্তমানে সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ হিসেবে খেদমত করছেন, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মোকাররম মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের সদর হিসেবে ২০১১-২০১৫ সাল পর্যন্ত খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, বর্তমানে আমেরিকাতে বসবাস করছেন। আমি মরহুমের বড় ছেলে একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে বেলজিয়ামে বসবাস করছি। মরহুমের আহমদীয়াতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও ত্যাগের প্রতিদানে এভাবেই মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মতো অধমদেরকে অভাবনীয় পুরষ্কারে ভূষিত করেছেন এবং এর ধারা তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যেও জারি থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

সকলের কাছে দোয়ার আবেদন, আমরা যেন ইসলাম, আমদীয়াতের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা, তাঁর দেয়া শিক্ষা-আদর্শগুলো আজীবন ধরে রাখতে পারি এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও সেই আদর্শে গড়ে তুলতে পারি, আমীন।

মরহুমের জন্য দোয়ার অনুরোধ রইল, মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে অধিষ্ঠিত করেন, আমীন।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।"

আমীন, সুম্মা-আমীন।

সংবাদ

নারাণগঞ্জ জামা'তে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৪/০৮/২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ ভূইয়া। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ফজল মাহমুদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মাওলানা তাহের আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। এরপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। এরপর বাংলা নযম পেশ করেন জনাব ফখরুল ইসলাম সেতু। এরপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান মুরুব্বী সিলসিলাহ্।

সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম ফজল মাহমুদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। সবশেষে সভাপতি সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামীম আহমেদ

সুন্দরবন জামা'তে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

সুন্দরবনের বড় ভেটখালী হালকায় গত ২৬/০৯/২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব মসজিদ বায়তুস সোবহানে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা আমীর জনাব এস. এম. রেজাউল করিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন রাকিবুল হাসান। নযম পাঠ করেন রায়হান হযরত রসূলে করিম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন জি. এম. সাব্বির আহমেদ, মাওলানা খুরশিদ আলম, শেখ আব্দুল ওয়াদুদ ও স্থানীয় আমীর জনাব এস. এম. রেজাউল করিম।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন খাকসার গাজী মিজানুর রহমান। জলসায় আনসার, খোদ্দাম, লাজনা ও মেহমানসহ সর্বমোট ১১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

গাজী মিজানুর রহমান

পার্ট টাইম চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি

হোমিওপ্যাথিক চেম্বারে ঔষধ সংক্রান্ত কাজ, অন্যান্য অফিসিয়াল ও বাইরের বিবিধ কাজের নিমিত্তে একজন এসিস্ট্যান্ট আবশ্যক।

যোগ্যতা:

১। ৫ ওয়াক্ত নামাযী ও নিয়মিত চাঁদাদাতা (কমপক্ষে ৩ বছর পূর্ব থেকে)।

২। H.s.c / Honors অথবা ডিকশনারী ব্যবহারে অভিজ্ঞ।

৩। পরিশ্রমী ও উদ্যমী।

শর্তাবলী:

১। কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনানুযায়ী সপ্তাহের যে কোন ৬ দিন কাজ করতে হবে।

২। প্রতিদিন গড়ে ৫ ঘন্টা করে মাসে (৫X২৫) ১২৫ ঘন্টা কাজ করতে হবে।

৩। ১২৫ ঘন্টার কম কাজ করলে অন্য মাসে তা পূরণ করতে হবে। ১২৫ ঘন্টার বেশী হলে সমানুপাতিক Overtime প্রদান করা হবে।

সম্মানী/বেতন: * ৬ মাস প্রশিক্ষণরত থেকে সন্তোষজনক হলে ৪০০০/- টাকা মাসিক প্রদান করা হবে।

* প্রশিক্ষণকালীন ৫০% দেয়া হবে। চাকুরী ছাড়তে হলে কমপক্ষে ১ মাস আগে লিখিতভাবে জানাতে হবে নতুবা ১ মাসের বেতন ছেড়ে যেতে হবে।

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম স্বপন
৩৭৫/৫/এ, উ. পীরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা
(ডনডিউ কোচিং গলি)
মোবা: ০১৯১৩০৪৯৪১৩,
০১৭২১৭৩৭৯২৫

মজলিস আনসারুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র ২৩তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৭ অনুষ্ঠিত

গত ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার ও শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আয়োজনে আহমদীপাড়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে ২৩ তম বার্ষিক স্থনীয় ইজতেমা ২০১৭ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন ব্যাপী উক্ত ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ নঈম আলম খান, কায়েদ উমুমী, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের সভাপতিত্বে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ হতে শুরু হয়।

প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ মঞ্জু। অনুষ্ঠানে উর্দু নযম পাঠ করেন ডা: মোবাশ্বের আহমদ। সভাপতি সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ ও ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণের পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। **"নামাযের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা"** বিষয়ে হুযুর (আই.) এর সাম্প্রতিক খুতবার আলোকে **"আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য"** প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেন মৌলানা জহির উদ্দিন আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। "যুগ খলীফা (আই.)-এর নির্দেশে আনসারদের উদ্দেশ্য দিক নির্দেশনামূলক" বক্তৃতা করেন জনাব মোশারফ হোসেন রিজিওনাল নাযেম আলা এবং **"তালিম তরবিয়তে আনসারুল্লাহ্-এর অগ্রনী ভূমিকা"** বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বক্তৃতা পর্বের শেষে প্রতিযোগিতার ১ম পর্বে কুইজ ও স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা এবং মাগরিব ও এশার নামাযের বিরতির পর রাত ৯.৩০ মিনিটে পর্যন্ত পয়গামে রেসানী ও বালিশ বদল খেলার প্রতিযোগিতা চলে। পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ ভোর রাত্রে ১৮ জন আনসার সদস্যের উপস্থিতিতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া হয়। প্রতিযোগিতার ২য় পর্বে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত (নাযেরা ও মুখস্ত) এবং নযম পাঠ (বাংলা ও উর্দু) অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্বে বক্তৃতা, দ্বীনিমালুমাত, লিখিত পরীক্ষা, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ ও ইন-আউট প্রতিযোগিতা হয়।

যোহর নামায ও খাবার বিরতির পর বেলা ৩ ঘটিকায় সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনা মোহাম্মদ নঈম আলম খান, কায়েদ উমুমী, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ।

প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী জনাব নাসির আহমদ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং ডা: মোবাশ্বের আহমদ নযম পাঠ করেন। **"তবলীগ খাস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে হুযূর (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবার আলোকে আনসারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য"** প্রসঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এস. এম. আবু তাহের মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তবলীগ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম আলা। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব আমীর মোহাম্মদ খঅন (জামাল), সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ, আহাদনামা পাঠ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং উপস্থিত সবাইকে নিয়ে গ্রুপ ছবি তোলা হয়।

বিষ্ণুপুর, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সরাইলের মেহমানসহ প্রথম দিন ৬৭ জন এবং ২য় দিন মোট ৫৯ জন আনসার সদস্য ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব, যয়ীম আলা

সন্তান লাভ

গত ১৩ই অক্টোবর ভোর রাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। নবজাতক বড় হয়ে যেন জামাতের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে জামাতের সেবা করতে পারে এবং তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

নবজাতকের নানা সেলবরষ জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আ.ক.ম. নূরুল আমীন।

মোহাম্মদ হুমায়ন কবীর ও
ফয়েজা আমীন তন্বী

মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর-এর ১১তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৭ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ৫ ও ৬ অক্টোবর, ২০১৭ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর এর ১১তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের সদর আলহাজ্ব আহমদ তবশির চৌধুরী এর সভাপতিত্বে ৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের এবং নযম পাঠ করেন এনামুল হক রাসেল। উদ্বোধনী অধিবেশনে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন স্থানীয় যয়ীম আলা আবু জাকির আহমদ। তরবীয়তী সভায় **"কিভাবে আপনি একজন আল্লাহর বান্দায় পরিণত হবেন এবং ইসলাম আহমদীয়াতের দৃষ্টিতে একজন আহমদী সদস্যের মান কীরূপ হওয়া উচিত?"** বিষয়ে নসিহতমুলক বক্তব্য পেশ করেন সালেহ আহমদ সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ। নসীয়তমূলক বক্তব্য পেশ করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিরপুর এর সম্মানিত আমীর বি. আকরাম আহমদ খান চৌধুরী। তরবিয়তি সভায় স্থানীয় আনসার, খোদ্দাম ও মেহমানসহ ১২০ জন অংশগ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্যবৃন্দ, ঢাকা রিজিওনাল নাযেম আলা ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ইজতেমায় যোগদান করেন। ইজতেমার হাজিরা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় প্রতিটি আনসার সদস্যদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও ইজতেমার সিলেবাস ও অনুষ্ঠানসূচি ফটোকপি করে সদস্যদের নিকট পৌছানো হয়েছে। ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্যে নও মোবাইনদের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে অংশগ্রহনকারী ২২ জন নওমোবাইনকে পুরস্কৃত করা হয়। অর্থসহ নামায শিক্ষা প্রতিযোগীতা এবং নও-মোবাইনদের জন্য মৌখিক তালিমী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় ১২০ জন স্থানীয় আনসার সদস্য ও কিছু সংখ্যক মেহমান অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ৩৫ জন আনসার সদস্য বা-জামাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন।

৬ অক্টোবর, শুক্রবার বিকাল ৪টায় মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের নায়েব সদর আউয়াল আলহাজ্জ নাজির আহমদ এর সভাপতিত্বে ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অধিবেশনে মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুরের বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৭ পেশ করেন মোন্তাযীম উমূমী রফিকুল ইসলাম। ইজতেমায় তালিমী ও খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়াও তবলীগ, তরবিয়ত নও মোবাঈন ও ইসার বিভাগের উত্তম কর্মীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৭ শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হালকা সমূহের নাম ঘোষণা করা হয়। কাজীপাড়া হালকার জয়ীম তালহা শের আলীর হাতে শ্রেষ্ট হালকার ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও আহমদনগর ও মোকামী হালকাকে উত্তম হালকা ঘোষণা করা হয় ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। আহাদ পাঠ ও দোয়ার পর সভাপতি সাহেব ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম

ঈদ পুনঃর্মিলনী অনুষ্ঠান- ২০১৭ অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ জনাব আব্দুল আলীম খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে ঈদ পুনঃর্মিলনী উদযাপন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক। নযম পাঠ করেন জনাব এস. এম. রহমত উল্লাহ্ সাহেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ। অত:পর ঈদের আনন্দ সকলের সাথে ঈদের অনুভূতি ভাগাভাগি করেন। অত্যন্ত আনন্দ ঘন পরিবেশে সকলের সাথে কোলাকুলি ও মিষ্টিমুখ করানো হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব ডা. সেলিম মোহাম্মদ শাহজাহান সাহেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল ১২৫ জন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

খুলনা, যশোর, রঘুনাথপুরবাগ ও স্বর্পরাজপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক ইজতেমা- ২০১৭ অনুষ্ঠিত

গত ০৬ ও ০৭ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনায় খুলনা, রঘুনাথপুরবাগ ও স্বর্পরাজপুর মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র অংশগ্রহণে বার্ষিক আঞ্চলিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্র হতে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশের মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি নায়েব সদর জনাব গোলাম কাদের এবং তাঁর সফর সঙ্গি কায়েদ মাল জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ সাহেব যোগদান করেন। উক্ত ইজতেমায় রিজিওনাল নাযেমে আলা জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, খুলনা-যশোর জেলার জেলা নাযেম আলা জনাব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, খুলনা জামাতের আমীর জনাব এস. এম. আনসার উদ্দীন এবং মুরব্বী সিলসিলাহ মাওলানা রইস আহমদ উপস্থিত ছিলেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশের মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি নায়েব সদর জনাব গোলাম কাদের সাহেবের সভাপতিত্বে ০৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৩.৩০ মিনিটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইজতেমা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কায়েদ মাল জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, রিজিওনাল নাযেম আলা জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, খুলনা-যশোর জেলার জেলা নাযেম আলা জনাব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, খুলনা জামাতের আমীর জনাব এস. এম. আনসার উদ্দিন এবং মুরুব্বী সিলসিলাহ্‌ মাওলানা রইস আহমদ ইজতেমার গুরুত্ব এবং আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর বক্তব্য রাখেন।

০৬ ও ০৭ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক আঞ্চলিক ইজতেমায় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায, দরসে কুরআনসহ তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনি মালুমাত-লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, বক্তৃতা, পয়গামে রেসানী, প্রশ্নোত্তর (কুইজ), হুযূর (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খোৎবার ওপর প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মুরুব্বী সিলসিলাহ্‌ মাওলানা রইস আহমদ এবং রিজিওনাল নাযেম আলা জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব।

ইজতেমা অনুষ্ঠানের ১ম দিন অর্থাৎ ০৬ অক্টোবর, ২০১৭ শুক্রবার বাদ মাগরিব হুযূর (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খোৎবা শ্রবণের পর নায়েব সদর জনাব গোলাম কাদের সাহেবের সভাপতিত্বে এক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন বক্তব্য শোনা হয় এবং সে আলোকে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য, খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং এতায়াতে নেযাম এই বিষয়ের বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাজক, রিজিওনাল নাযেম আলা, জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, কায়েদ মাল এবং সভাপতি মহোদয়।

ইজতেমা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ০৭ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার অন্যান্য কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর সকাল ৮-৩০ মিনিট হতে ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শেষে মোহতরম সদর-এর প্রতিনিধি ও নায়েব সদর জনাব গোলাম কাদের সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কায়েদ মাল মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, স্থানীয় আমীর জনাব এস. এম. আনসার উদ্দিন ও রিজিওনাল আযেম আলা জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোহতরম সদর এর প্রতিনিধি নায়েব সদর জনাব গোলাম কাদের সাহেব আনসারুল্লাহ্‌ সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহদের দিক নির্দেশনা উল্লেখ পূর্বক অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরিশেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দুই দিন ব্যাপী এই বার্ষিক আঞ্চলিক ইজতেমায় খুলনা-যশোর জেলা মজলিসের ০৪ টি স্থানীয় মজলিসের মধ্যে ৩টি মজলিস হতে ৩৫ জন আনসারসহ প্রায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌, ঢাকা-র বৃক্ষরোপন কর্মসূচী-২০১৭

গত ২৮ সেপ্টেম্বর-২০১৭ বৃহস্পতিবার মজলিস আনসারুল্লাহ ঢাকার উদ্যোগে **৭৮ নং পিলকুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়** প্রাঙ্গনে **বৃক্ষরোপন কর্মসূচী** সম্পন্ন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোছা. জেসমিন সাহেবা উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সভাপতি মো. মোস্তফা মোল্লা সাহেব, প্রাক্তন সভাপতি মোহম্মদ মোবারক হোসেন। জনাব মফিজুল ইসলাম স্বপন, মোন্তাযেম ঈসার সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী শুরু হয়। এ কর্মসূচীতে আহমদী আনসার ভাই ছাড়াও স্কুলের শিক্ষক-বৃন্দ ও বিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের মাঠের চতুর্দিকে প্রায় ৫৫ টি উন্নত মানের বিভিন্ন জাতের চারা গাছ পর্যায়ক্রমে লাগানো হয়।

শফিকুল হাকিম আহমদ

শ্যামপুর জামাতে নও-মোবাইন ও অন্যান্য সদস্যদের তরবিয়তি প্রশিক্ষনের জন্য আঞ্চলিক প্রশিক্ষন ক্লাস অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শনিবার ১দিন ব্যাপি আঞ্চলিক নও-মোবাইন সম্মেলন শ্যামপুর জামাতের নবনির্মিত মসজিদে নাসের এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। রংপুর, শ্যামপুর, মাহিগঞ্জ ও সৈয়দপুর জামাতের নও-মোবাইন (নতুন আহমদী) সদস্য ও সদস্যদের তরবীয়তি প্রশিক্ষনের জন্য এই প্রশিক্ষন ক্লাসের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল এডিশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত ও ওয়াকফে জাদীদ নও-মোবাইন আবু জাকির আহমদ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে ৪টি জামাতের ৩৪ জন নও-মোবাইন সদস্য ও সদস্যাদের তরবিয়তী প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় জামাতসমুহের প্রেসিডেন্ট ও মোয়াল্লেম সাহেবান সহ ৩৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করেন। দিনব্যাপি এই তরবিয়তী প্রশিক্ষন ক্লাসে অংশগ্রহনকারী নও-মোবাইনগন তাদের পরিচিতি তুলে ধরেন। ব্যক্তিগত পরিচয় পর্বে নও-মোবাইনগন তারা কিভাবে আহমদীয়া জামাতের সাথে পরিচিত হলেন এবং বয়আত গ্রহণের ক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাতের আকর্ষনীয় দিক সমূহের বর্ননা করেন। উপস্থিত নও-মোবাইন সকলেই আহমদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার মাধ্যমে তারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং নিজ পরিবারে আহমদীয়াতের পালনীয় কর্তব্য সমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন ও নিজ গন্ডিতে আহমদীয়াতের সংবাদ পৌছানোর অঙ্গিকার করেন।

শ্যামপুর নিবাসী জামাতের প্রবীন বুযুর্গ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব আহমদীয়া জামাতের সত্যতা ও যুগ খলিফার আনুগত্যের উপকারীতা সর্ম্পকে আলোচনা করেন। রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক তবলীগ আহবায়ক মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহর সমন্বয়ে এই তরবীয়তি ক্লাসের আয়োজন করা হয়। তিনি আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের সাথে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ও তাদের দোয়া কবুলিয়তের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ননা করেন। এছাড়াও আর্থিক কুরবানীর ফজিলত এবং নেযামের আনুগত্যের ফজিলত বর্ননা করা হয়। নও-মোবাইনগনকে আহমদীয়া মসজীদে নিয়মিত জুম্মার নামায আদায় এবং এম.টি.এ.র মাধ্যমে যুগ খলিফার খুতবা সরাসরি শ্রবনের জন্য অনুপ্রানিত করা হয়। এছাড়াও নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ইসলামী শিক্ষানুযায়ী পরিবারিক জীবন যাপন ও পত্র যোগে যুগ খলিফার সাথে ব্যাক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের আহবান জানানো হয়।

শরীফ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ

যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লার সাবেক প্রেসিডেন্ট কামাল পাশা সাহেব গত ১০/০৬/২০১৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর। তিনি ২০০৪ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার মাধ্যমেই আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লার একটি স্বতন্ত্র জামাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মরহুম অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব পালন সময়কালেই খেলাফত শতবর্ষের স্মারক মসজিদ ফতুল্লায় তৈরী হয়। তিনি অবসরকালীন সময় পর্যন্ত সরকারী চাকুরীজীবি ছিলেন। বাংলাদেশের ডাক বিভাগের অধীনে চাকুরী করতেন। মরহুম সদালাপি ও সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন। মরহুমের পিতার নাম ছিল মোহতরম মোহর আলী সাহেব। জামাতের সেবায় ছিলেন সদা নিষ্ঠাবান। জামাতের নির্দেশনাবলী পালনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও প্রতিদিন তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন ও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন ফতুল্লা জামাতের একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন মুসি ছিলেন। তাঁর ওসীয়্যত নং ৪৩০৮১। মরহুম মৃত্যুকালে ১ স্ত্রী ২ পুত্র ২ কন্যা ও নাতী নাতনী রেখে যান। তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর জামাতী সকল প্রকার চাঁদা পরিশোধ করেন। তাঁর মৃত্যুতে জামাত একজন সত্যিকারের মু'মিনকে হারালো। বহুগুণের অধিকারী মরহুমের যিকরে খায়ের গত ১৬/০৬/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। জামাতে বুযুর্গ ব্যক্তিগণ তাঁর যিকরে খায়ের করেন। যিকরে খায়ের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মোহতরম আবদুর রহমান সাহেব, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা।

আবদুর রহমান

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

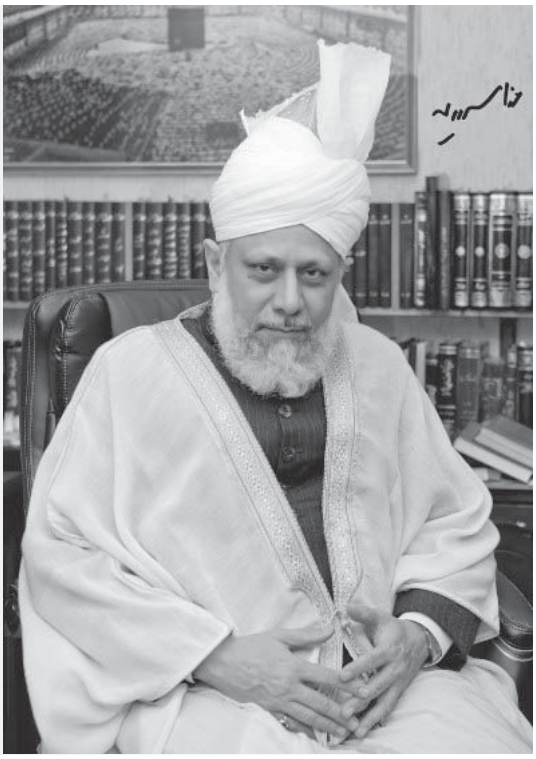

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

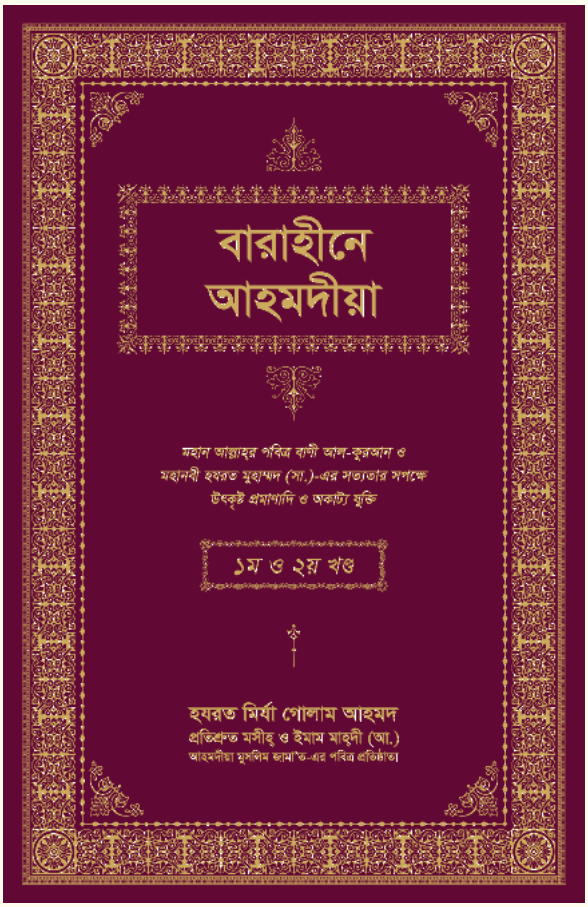

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

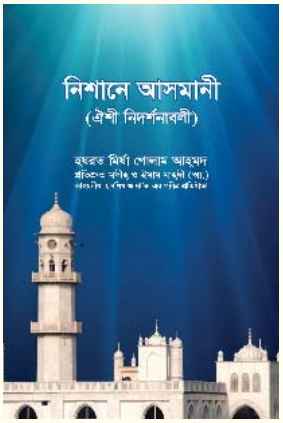

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্‌দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

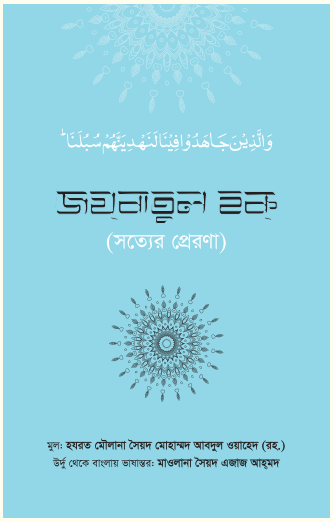

জয্‌বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 80 | 8th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st October, 2017 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

একটু পড়েই দেখি-

"যারা খাবারের বিলটা সবসময়ই নিজে দিতে চায়, তার মানে এই নয় যে, তার টাকা উপচে পড়ছে। এর কারণ সে টাকার চেয়ে বন্ধুত্বকে বড় করে দেখে।"

"যারা আগে ভাগেই কাজ করে ফেলে, এর মানে সে বোকা নয়, আসলে তার দায়িত্বজ্ঞান রয়েছে।"

"যারা ঝগড়া বা বাক-বিতন্ডার পরে আগে মাফ চেয়ে নেয়, সে-ই ভুল ছিল এমনটি নয় বরঞ্চ সে চারপাশের মানুষকে মূল্যায়ন করে।"

"তোমাকে যে সাহায্য করতে চায় সে তোমার কাছে কিছু আশা করে না বরং একজন প্রকৃত বন্ধু মনে করে।"

"কেউ আপনাকে প্রায়ই টেক্সট করে তার মানে এটা নয় যে, তার কোন কাজ নেই, আসলে সে আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে।"

"একদিন আমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো, কিন্তু আমাদের আচরণ ও ভালোবাসাগুলো মানুষের হৃদয়ে থেকে যাবে। কেউ না কেউ স্মরণ করবে, এ হচ্ছে সেই মানুষ যার সাথে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু সময় কাটিয়েছি।"

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

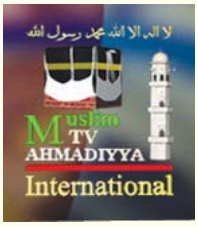

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com